# ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা-সাহিত্য

মহীবুল আজিজ

# ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা-সাহিত্য

www.pathagar.com

# ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা-সাহিত্য

মহীবুল আজিজ

ঐতিহ্য

www.pathagar.com

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪১৩
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রচ্ছদ
শিবু কুমার শীল

মূল্য : একশত বিশ টাকা

OUPANIBESHIK GUGER SHIKKHA-SAHITTO by Muheebul Aziz
Published by Md. Arifur Rahman Nayeem Oitijjhya.
Date of Publication : February 2007

website : www oitijjhya.com

Price : 120.00 Taka US $ 5.00

ISBN 984-776-504-9

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সৈয়দ আকরম হোসেন
শ্রদ্ধাস্পদেষু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# পূর্বভাষ

৬টি প্রবন্ধের সমন্বয় বর্তমান গ্রন্থ। ঔপনিবেশিক শিক্ষাসম্পর্কিত প্রবন্ধদ্বয় উনিশ শতকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং অন্যান্য সূত্রের আলোকে রচিত। প্রবন্ধ দুটিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালে বাংলায় বিরাজমান শিক্ষা-অবস্থার রূপরেখা ধরা গেছে। এসময়ে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারি-সরকারি দ্বন্দ্বের বাস্তবতার প্রসঙ্গটি বারংবার উঠে এসেছে। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিকতা নিয়ে সেরকম মূল্যায়ন হয় না, অথচ তাঁর সাংবাদিকতা একই সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রমাণ। গ্রন্থভূর্ত অন্য প্রবন্ধ তিনটিকে বলা যায় আবিষ্কার। ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ শহরে বসবাসকালে (১৯৯১-১৯৯৭) এগুলো কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির দুর্লভ গ্রন্থের সংগ্রহ থেকে আমি উদ্ধার করি। রামকিনু দত্ত সর্বভারতীয় পর্যায়ে এ্যাংলো-ভারতীয় কবি হিসেবে উল্লেখযোগ্য আসনের দাবিদার। ১৮৯২-র সেপ্টেম্বরে কলকাতার চার্চ মিশনারি সোসাইটি স্কুল থেকে প্রকাশিত 'ছাত্রমিত্র' বাংলা ভাষার প্রথম শিক্ষা-পত্রিকা, যার সন্ধান এই প্রথম পাওয়া গেল। জেমস ড্রমন্ড এন্ডার্সন বা জে ডি এন্ডার্সনকে বলা যায় ইংরেজ বাঙালি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু-সুহৃদ এন্ডার্সনের কর্ম সম্পর্কে মূল্যায়ন সমগ্র বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

নানান দুর্লভ বিষয় সম্পর্কিত প্রবন্ধগ্রন্থটি প্রকাশের জন্যে ঐতিহ্য-র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান নাইম-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গ্রন্থের প্রচ্ছদশিল্পী শিবু কুমার শীলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মহীবুল আজিজ

জানুয়ারি ২০০৭
বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## সূচি


| | |
|---|---|
| বাংলায় ঔপনিবেশিক শিক্ষা | ১১ |
| অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমি এবং কবি রামকিনু দত্ত | ২৩ |
| রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সাংবাদিকতা | ৫০ |
| প্রথম বাংলা শিক্ষা-পত্রিকা | ৬০ |
| জেম্‌স্ ড্রমন্ড এন্ডার্সন ও তাঁর কর্ম : একটি মূল্যায়ন | ৮৫ |
| ঔপনিবেশিক শিক্ষা : দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিত | ১০৪ |


www.pathagar.com

www.pathagar.com

# বাংলায় ঔপনিবেশিক শিক্ষা

মোঘল এবং নবাবরা থাকতে থাকতে বা যেতে না যেতেই এসে পড়ল বাইরের অন্যরা। সকলের লক্ষ্য গাঙ্গেয় বদ্বীপ বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলা হত গঙ্গাঋদ্ধি, গ্রিস দেশে 'গঙ্গরিডই'। কাছাকাছি এসে পড়েছিল সকলেই—ডাচরা চিনশুরায়, ডেনিশরা শ্রীরামপুরে, ফরাসিরা চন্দননগরে এবং ইংরেজরা হুগলি নদীর উপকূল ছেড়ে একসময়ে প্রাণকেন্দ্রে, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে। উপনিবেশ বিস্তারকারী এঁরা সকলেই ছিলেন বিজ্ঞানে অগ্রবর্তী ; কিন্তু বিজ্ঞান এবং কৌশল ও চাতুর্যের সমন্বয়ে রইল বাকি শুধু এক—ইংরেজ। ক্ষমতা দখলের চার দশকেরও কম সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রচলিত নিয়ম-কানুন সব তারা বদলে দিল। ভারতবর্ষে দৃশ্যমান একমাত্র সম্পদের উৎস ভূমির ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাল তারা। প্রাচীনকাল থেকে বা মোঘল আমলেও ভূমির সঙ্গে দেশবাসীর যে সম্পর্ক ছিল তাকে আমূল বদলে দিয়ে একে ব্যক্তি মালিকানার বিষয় করতে সক্ষম হল ব্রিটিশরা। ভূমিসংস্কারের এই সাফল্য থেকেই তারা দৃষ্টি ফেরাল শিক্ষার দিকে। উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক থেকে শুরু করে গোটা শতাব্দী জুড়ে এবং শতাব্দী পেরিয়েও চলতে লাগল তাদের শিক্ষা-তৎপরতা।

১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ব্রিটিশ প্রণীত আইন-কানুনের পক্ষে বলা হয় যে তারা আসলে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাকে সংস্কার সাধনের মাধ্যমে একে উন্নততর রূপ দিতে আগ্রহী। কিন্তু কার্যত ঘটল অন্য ঘটনা। শিক্ষা প্রসঙ্গেও একই কথা। এক্ষেত্রেও প্রশাসক ব্রিটিশরা প্রাথমিকভাবে এমন বক্তব্য রাখে যে তারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছে দিতে আগ্রহী এবং তার মাধ্যমে ভারতবাসীকে একটা সুষম জীবন লাভে সহায়তাদানই তাদের ঐকান্তিক কামনা। পুরো উনিশ শতক জুড়ে ইংরেজদের শিক্ষা বিষয়ক এত কর্মকাণ্ড চলে যে এই শতাব্দীকে শিক্ষা-শতাব্দীও আখ্যা দেয়া চলে। ভূমির পর শিক্ষাকে বেছে নেওয়ায় উদ্দেশ্য হল মানুষের সত্তার অদৃশ্য সম্পদ মনন জগৎকে করায়ত্ত করা। যদিও প্রতিটি শিক্ষা-কর্মকাণ্ড প্রণয়নে ব্রিটিশদের বক্তব্য হল, ভারতবাসীর স্বার্থে, তাদের অবস্থার উন্নয়নেই সেসবের আয়োজন। কাজটা যে খুব সহজ ছিল তা কিন্তু নয়।



www.pathagar.com

একটা দীর্ঘদিনের প্রচলনকে সহসাই বদলে দেয়া কঠিন কাজ, সেটা তারা করেও না। তারা এগোয় ধীরে, পর্যায়ক্রমে। শতাব্দী শেষে দেখা যায় ভারতবর্ষের এবং বাংলা অঞ্চলের শিক্ষাচিত্র শতাব্দীর শুরুর ঠিক বিপরীত। উভয়ের ব্যবধান দুই মেরুর মধ্যকার দূরত্বের মতন। ইংরেজি শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ, শিক্ষা বিষয়ক তৎপরতা প্রভৃতির প্রভাবে সমাজ-ধর্ম-পরিবার সব ক্ষেত্রে সূচিত হল পরিবর্তন, কখনো কখনো এ পরিবর্তনকে বলা চলে বৈপ্লবিক।

ব্রিটিশরা ভূমির নিয়ন্ত্রণ প্রথমে নিলেও শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাভাবনাও সক্রিয় ছিল তাদের মধ্যে। হ্যালহেডের ব্যাকরণ থেকে শুরু করে আইন-কানুন ও বিবিধ শাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থানুবাদে তাদের উদ্যোগ প্রথম থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা পেতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যতই প্রশাসনিক চিন্তার বাস্তবায়ন হোক না কেন তা আসলে শিক্ষার বিষয়টিকেই সামনে নিয়ে আসে। অনুবাদের তৎপরতা স্থানীয় ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র নির্মাণ সন্দেহ নেই কিন্তু তা যে অচিরেই মিশনারি তৎপরতা ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত গ্রামেও চলে যাবে তার নজির মিলতে শুরু করে কিছুকালের মধ্যেই। যখন সাংগঠনিকতা একটা মজবুত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে গেল তখনই ব্রিটিশ প্রশাসন মিশন কোম্পানি—সর্বদিক থেকে একটা সমস্বর আওয়াজ উঠল যে দেশীয়রা অশিক্ষা-অর্ধশিক্ষা-কুশিক্ষায় নিম্নস্তরের জীবনযাপন করছে, কাজেই তাদের প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। শুরু হল শিক্ষা মিশন।

ইংরেজরা আসার আগে কি শিক্ষা ছিল না এদেশে ! ছিল এবং সেটা ছিল দেশীয় ধরনের শিক্ষা। ১৮৯১ সনে প্রকাশিত এফ ডব্লুউ থমাসের শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ থেকে এদেশের পুরনো শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। শিশুরা পাঠশালায়-টোলে যেত গুরুমহাশয়দের কাছে পাঠ নিতে। সেটা হয়ত রীতিসিদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিকতার ফসল ছিল না ; কিন্তু অলিখিত কিছু কানুন সেখানেও ছিল। প্রথম ৮/১০ দিন শিশু স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ পড়ত, শিখত। হয়ত প্রথম বছর কেটে যেত মুখে মুখে লেখাপড়ায়। পরের বছর তালপাতায় লেখা। ধীরে ধীরে যুক্তাক্ষর, শব্দ, সংখ্যা, টাকা পয়সার হিসাব, মাপজোখ। পদবি, ব্যক্তি, স্থান নামের মাহাত্ম্য কিংবা গণিত—একটু বড়ো হলে। জমি, ব্যবসা, কৃষিকাজ প্রভৃতি ব্যবহারিক প্রয়োজনের বিষয় পেরিয়ে সম্বোধন, পত্রলিখন ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে জীবনে চলতে গেলে ভারতবর্ষের প্রচলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামব্যবস্থায় যা যা দরকার বলে মনে হত তারই পাঠ তারা দেশীয় পাঠশালায় পেত।

শিক্ষা বিষয়ে ব্রিটিশদের মনোযোগ এতখানি হওয়ার কারণ ভারতবর্ষে তারা একচেটিয়া কর্তৃত্বের দাবিদার। অথচ এই ইংরেজদেরই প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য স্কুল (১৭২৯) কলকাতায় চালু ছিল বহুকাল। ১৭৫৬ তে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা সেটি বন্ধ করে দেন তাঁর ক্ষমতবলে। ১৭৮৭ তে ইংরেজরা পুনরায় চালু করে বন্ধ হয়ে


www.pathagar.com

যাওয়া স্কুলটি। এ সময়ে আরো কিছু সেবামূলক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যেগুলোর প্রতিষ্ঠাতা সমাজের দানশীল ব্যক্তি কিংবা সেবা প্রতিষ্ঠান। এগুলোর লক্ষ্য ছিল একই সঙ্গে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবা এবং পাশাপাশি শিক্ষাদান। ১৭৮৯ তে প্রতিষ্ঠিত হয় মিশনারি স্কুল, ফ্রি স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে। ১৮০০-র পরে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের উদ্যোগে মিশন স্কুল। ১৮১৪-য় চিনশুরাতে রেভারেন্ড মে'র স্কুল। চিনশুরায় তখন আর ডাচরা নেই, ইংরেজরা হঠিয়ে দিয়েছে তাদের। ১৮২৩-এ বহরমপুর স্কুল, ১৮২৪-এ মুর্শিদাবাদ মাদ্রাসা, ১৮২২-২৪-এ কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ। মোটামুটিভাবে শিক্ষাটা চলছিল সেবামূলক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ। তাতে দেশের অল্পসংখ্যক লোক সংশ্লিষ্ট ছিল এবং মূলত দরিদ্ররাই তাতে সেবা পাচ্ছিল।

১৮১৮-তে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার আগে এবং পরে যেসব আয়োজন চলে তাকে এক ধরনের নবনির্মাণ প্রস্তুতি বলা চলে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কল্যাণে যে বাংলা গদ্য তৈরি হল তা প্রশাসনিক কাজেকর্মে ব্যবহৃত হতে থাকল। এরই মধ্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। যাকে ইন্ডিয়ান প্রেস বা ভারতীয় সংবাদপত্র বলা হয় তার ভিত্তি স্থাপিত হয়ে গেছে। বাংলায় সে ভিত্তি সত্যিকার অর্থেই প্রস্তরফলকযুক্ত। নানামুখী প্রচারণা চলছে প্রকাশনাকে ঘিরে, চলছে নানাবিধ কালাকানুনের প্রণয়ন এবং বিরোধিতা। হিকির বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০, ১৭৮২) থেকে শুরু করে ক্যালকাটা গেজেট (১৭৮৪-১৭৯৯), ক্যালকাটা ক্রনিকল (১৭৯২-১৭৯৪), ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া (১৮১৮-১৮৭৬), বেঙ্গল হরকরা (১৮২৪-১৮৬৬), বেঙ্গল ক্রনিকল (১৮২৭-১৮৩০), বেঙ্গল হেরাল্ড (১৮২৯-১৮৪৩) এবং আরো কিছু পত্র-পত্রিকা উনিশ শতকের প্রাথমিক পর্বে বাংলার সংবাদপত্র জগতের প্রতিনিধি। একই সঙ্গে প্রস্তুয়মান সমাজের নানাদিক এসব পত্রিকায় প্রচারিত হলে সংবাদপত্রের জনসম্পৃক্ততার বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে থাকে। এটাও লক্ষণীয় যে কেবল ব্রিটিশ নয় স্থানীয়রাও ক্ষেত্রবিশেষে সংবাদপত্রের মালিক, প্রকাশক কিংবা সম্পাদক। এই ধারা অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে স্থানীয়রাই ছাড়িয়ে যায় বিদেশীদের। ১৮৭৩-এ স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল-এর নির্দেশে কৃত জরিপে দেখা যায় বাংলায় অন্তত ৩৮টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যেগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি খ্যাতনামা যেমন, অবলা বান্ধব, সাপ্তাহিক পরিদর্শক, সহচর, জ্ঞানবিকাশিনী (চাটমোহর), বিশ্বদূত, সুলভ সমাচার, বরিশাল বার্তাবহ, রংপুর দিক প্রকাশক, ভারত সংস্কারক, বঙ্গবন্ধু (ঢাকা), ঢাকাপ্রকাশ, সোমপ্রকাশ, দূরবীণ, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর ইত্যাদি।

মিশনারি কিংবা সরকারি যা-ই হোক না কেন সংবাদপত্র তাদের শিক্ষা বিষয়ক প্রচারণার একটি বড়ো হাতিয়ারে পরিণত হল। স্মর্তব্য শিক্ষা ছাড়াও পত্রপত্রিকা কিংবা প্রকাশনার আশ্রয়ে বিধবা বিবাহ, ব্রাহ্মধর্ম, সতীদাহ ইত্যাদি


www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ অনেকটা কালই সরগরম করে রাখে বাংলার সমাজকে। আর সব প্রসঙ্গেই শিক্ষার ব্যাপারটি চলে আসে সামনে। মিশনারিদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শিক্ষার মাধ্যমে স্থানীয় জনমানসে সচেতনতা জাগাতে পারলে একদিন মানুষ সাদরে খ্রিষ্টধর্মকে বরণ করে নেবে। ফলে শিক্ষার ওপর তাদের মনোযোগ বাড়তে থাকে উত্তরোত্তর, এমনকি শিক্ষাটাকেই তারা সর্বাধিক ক্ষমতাবান করে তুলতে চাইল সেই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে। ফলে শিক্ষা এবং ধর্মকে মিলিয়ে একটা বক্তব্য প্রকাশ পেতে শুরু করল নানা দিক থেকে। বিষয়টাকে মিশনারিরা দেখল একভাবে, সরকারি লোকেরা অন্যভাবে। পাশাপাশি পত্র-পত্রিকা তো ছিলই। ১৮১৭ সালে ড. মার্শম্যান বললেন যে বাংলার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী মূলত তারাই। তারা নিজের ভাষায় কিছু লেখাপড়া শিখতে পারলে হিসাবনিকাশ জানতে বুঝতে পারলে তাদেরই লাভ। ফাঁকি-প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাবে তারা। মার্শম্যান সে কারণে সরকারের সুদৃষ্টি প্রত্যাশা করেন। ১৮২৩-এ রাজা রামমোহন রায় লর্ড এ্যামহার্স্টকে একটি পত্র লেখেন যার মর্মার্থ হল ব্রিটিশ প্রশাসন চাইলে এশিয়ায় মানে ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রচারের কাজটা সুচারুরূপে হতে পারে। মার্শম্যান যখন তাঁর বক্তব্য রাখেন তখনো ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির প্রত্যূষলগ্ন এবং রামমোহন রায়ের সময়ে সোসাইটি এগিয়ে গেছে খানিকটা পথ। মার্শম্যানের কণ্ঠে হয়ত মিশনারি বা রাজকর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যের পূর্বসূত্র পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় ! তিনি হয়ত ভেবেছিলেন যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ ইংরেজদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলে তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মেরই লাভ। কারণ মূলত সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই পরবর্তীতে ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী হয়। তাছাড়া ব্রাহ্মধর্মের বক্তব্য ও দর্শন হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে যে খানিকটা শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন সেটা রামমোহন রায় বুঝতেন। ১৮২৯-এ সতীদাহ প্রথা রদ হয়ে গেলে সমকালীন পত্র-পত্রিকা এবং শিক্ষার গুরুত্ব প্রশ্নহীন অবস্থায় এসে দাঁড়াল। সুবিধা ইংরেজ শাসকদেরও হল। তাঁরা যে জনগণের মঙ্গল সাধনে ব্রতী সেই কথাটা এইসব কানুন ও উদ্যোগের দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন। বলা যায় সতীদাহ রদের পর ইংরেজি শিক্ষার বিষয়টি আরো উচ্চকিত হয়ে উঠল।

রাজা রামমোহন রায় যেখানে শিক্ষা-সাহিত্য ও বিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ ছিলেন সেখানে শাসকপক্ষীয়রা এগোলেন আরো দূর। মাত্র দুই বছর পরেই প্রকৃত কথাটা বেরোল— বললেন রেভারেন্ড উইলিয়াম এ্যাডাম। তাঁর মতে ভারতে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার-প্রসারের আয়োজন সুচারুরূপে করা দরকার। সেজন্যে যে মিশনারি স্কুলগুলো রয়েছে তাদের মাধ্যমে ইয়োরোপীয় শিক্ষা, ইংরেজিতে খ্রিষ্টীয় নীতিধর্মের প্রচারণায় পরোক্ষভাবে প্রভাব খাটানো যায়। এ্যাডাম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাকে বিপুল আয়োজনে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমেই কেবল দেশীয়দের


www.pathagar.com

নতুন ধর্মের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে। ১৮৩৫-এ টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনেরও দুই বছর আগে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট কণ্ঠে জানান যে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একবার যদি কেউ ইংরেজিতে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছে তবে নিশ্চিত যে সে আর তার ধর্মে আবদ্ধ থাকেনি। ম্যাকলের এ বক্তব্যের ভিত্তি নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী তিন দশককালের মিশনারি তৎপরতা এবং স্কুল সোসাইটির উদ্যোগ। তাঁর কথাটা যে কথার কথা নয় সেটা বোঝা গেল প্রশাসনের উচ্চ স্তরে তার প্রতিধ্বনিতে। ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ বাংলার গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক জানালেন যে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য প্রভৃতির সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া। আর ফারসি সরকারি ভাষা হিসেবে উঠিয়ে দিয়ে ইংরেজিকে তার জায়গায় বসিয়ে একটা বড় ধাপ পার হওয়া গেল। ১৮৩৫ এ ম্যাকলে জোর গলায় বলেছিলেনও, সংস্কৃত ও আরবির পাশাপাশি ইংরেজির ওপরেও দিতে হবে সমান গুরুত্ব।

একটু পেছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে ১৮৩৫-এ ম্যাকলে যে শক্তি বা জোরটা পাচ্ছেন শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে তা পেতেন না। সেটা বেশ বঙ্কুর সময়ই বলা যায়, তাঁদের জন্যে। ১৮১৪-তে এককালের শক্তিমান ডাচদের দুর্গ দখল করে মে সাহেব শুরু করলেন তাঁর প্রথম স্কুল। ১৮১৫-তে চিনসুরার সে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯৫১ জন। কিন্তু এক বছরেই সংখ্যাটা প্রায় দ্বিগুণ—২১৩৬। প্রতিষ্ঠিত হল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার স্কুল। দুই বছরেই মিশনারি উৎসাহে স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৬-এ। মে সাহেব মারা গেলে তাঁর জায়গায় এলেন পিয়ার্সন। যথেষ্ট উদ্দীপনায় শিক্ষাবিষয়ক তৎপরতা চললেও জনমানসকে প্রভাবিত করার কাজটা ছিল দুঃসাধ্য। মিশনারি তৎপরতা, স্বদেশী-ইংরেজি ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকার প্রচারণায় দেশীয়দের অনেকেই ভাবতে শুরু করে যে মে-পিয়ার্সন-স্টুয়ার্ট সাহেবেরা এবারে সবাইকে ধরে ধরে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দেবে। ফলে ইংরেজি-বিরোধী একটা শক্ত অবস্থান ঠিকই দাঁড়িয়ে যায়। ১৮১৬-তে চার্চ মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে বর্ধমানে স্কুল চালাতেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। এক গ্রামবাসীকে স্কুলে ছেলে পাঠানোর প্রস্তাব করলে সে জবাব দেয় প্রয়োজনে ছেলেকে জঙ্গলে রেখে আসবে শেয়ালে খাওয়ার জন্যে, তবু মরে গেলেও ইংরেজি স্কুলে পাঠাবে না। ১৮২২-এ চার্চ মিশনারি সোসাইটি পরিচালিত স্কুলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬০০ জন। তখনকার একটি ঘটনা—একটি মুদ্রিত পুস্তকে কেবল যিশুখ্রিষ্টের নাম ছাপানো দেখেই ছাত্ররা বেঁকে বসে। তারা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তাদের অভিভাবকগণ বেশ উষ্মা প্রকাশ করে যিশুর নামধারী পুস্তক এবং এর প্রচারকদের প্রতি। একটি স্কুলে ভালো শ্রুতলিপি লিখতে পারায় এক ছাত্রকে পুরস্কার দেয়া হয়। কিন্তু পুরস্কারটিতে যিশুর নামাঙ্কন দেখে ছাত্রটি


www.pathagar.com

মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেটা। স্কুলেরই একজন শিক্ষক বইতে যিশুর নাম থাকায় অনাগ্রহ প্রদর্শন করে। তখন একজন ব্রাহ্মণ তাকে বলে যে ভয় নেই বইটি সে-ও পড়েছে এবং এখনো সে খ্রিষ্টান হয়নি। স্কুলগুলোতে কী পড়ানো হত সেটা একবার দেখা যাক। সংস্কৃতর প্রাধান্য আছে এমন স্কুলের জন্যে ইয়েটস, কীথ, স্টুয়ার্ট, পিয়ার্সন-এর শব্দ, ভাষা, ব্যাকরণ, তালিকা ইত্যাদির বই ; কাশীনাথ-এর যুক্তিবিদ্যা, মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ ; অভিধান, নীতিকথা, মনোরঞ্জন ইতিহাস (অনুবাদে ইতিহাসের আকর্ষণীয় কাহিনী) এবং শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত দ্বিভাষিক পত্রিকা মাসিক দিগদর্শন। বাংলার প্রাধান্য থাকবে এমন বিদ্যালয়ের জন্যে রাধাকান্ত দেবের বানানের বই, ইয়েটস-এর সংস্কৃত ব্যাকরণ, পিয়ার্সন-এর টেক্সট বই, বাক্যাবলী, স্টুয়ার্ট-এর উপদেশ কথা, মনোরঞ্জন ইতিহাস এবং দ্বিভাষিক দিগদর্শন। এছাড়া ইংরেজির প্রাধান্যনির্ভর স্কুলের জন্যে হার্লে এবং মের গণিত, পত্রকৌমুদী (পিয়ার্সন), পাঠশালার বিবরণ (পিয়ার্সন), ভূগোলবৃত্তান্ত, নারীশিক্ষা-জমিদারি হিসাব নিকাশ, লসনের গল্প, ইতিহাস, ইংল্যান্ডের ইতিহাস, বিদ্যাহারাবলী (বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া, ফেলিক্স কেরী সম্পাদিত, ১৮২০)। এমনিতে উপর্যুক্ত পুস্তকাবলির তালিকা নির্দোষ বলে প্রতিভাত। কিন্তু প্রচল-অভ্যস্ত মানুষ সহজেই এগুলোকে মেনে নিতে রাজি ছিল না। ইংরেজরাও হাল ছাড়বার পাত্র নয়। তারা নিজেদের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দেশীয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সফল শিক্ষকদের চাকুরি হল তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে। জীবিকার নিশ্চয়তা পেয়ে স্থানীয় শিক্ষকরাও তখন অন্তত পেশার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবার জন্যে হলেও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা ও তাদের গ্রন্থরাজির প্রতি বাধ্যতা জাগাতে সচেষ্ট হল। স্কুলের সংখ্যার ক্রমপ্রবৃদ্ধির ফলে সমানুপাতিক হারে বেড়ে চলে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের সংখ্যাও।

ব্রিটিশদের শিক্ষা বিষয়টির লক্ষ্য কারা ছিল সেই বিষয়ে যে কাগজপত্র পাওয়া যায় এবং জেমস জনস্টন, এফ ডব্লুউ থমাস, এ্যাডাম্‌স-এর শিক্ষা রিপোর্ট, চার্লস ট্রেভেলিয়ান প্রভৃতির ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে মূলত ৫টি শ্রেণীকে তারা শিক্ষিত করে তুলবার কথা ভেবেছিল—(১) অভিজাত (২) মুসলমান (৩) অর্ধসভ্য আদিবাসী (তাদের ভাষায়) (৪) নিম্নবর্ণ হিন্দু (৫) অতি দরিদ্র। ১৮৩১-এ প্রথমবারের মতো শিক্ষাশুমারি হয় ব্রিটিশদের উদ্যোগে। এতে শতাব্দীর শুরু থেকে তিন দশককালের শিক্ষার অগ্রগতির একটা ছবি পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় বাংলা অঞ্চলের পুরুষ জনসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। এর মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকসংখ্যা ১৮ লক্ষ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক আওতাধীন ১০ লক্ষ লোক। আবার, নারী জনসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। এর মধ্যে লেখাপড়া জানা ৬১ হাজার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন ৩৬ হাজার। এই শুমারির পর থেকে শিক্ষা বিষয়ে বহু কর্মকাণ্ড হয়। চিঠিপত্র, কমিটি, মিটিং, প্রস্তাবনায় ছেয়ে যায়


www.pathagar.com

সরকারি দলিলরক্ষণ বিভাগ। একের পর এক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে স্কুল-কলেজ। সরকারি, মিশনারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগত সমস্ত রকম উদ্যোগ সক্রিয় থাকে। নারী শিক্ষাও এগিয়ে যায় বহুদূর। ১৮২১-এ কলকাতায় ছাত্রীদের জন্যে বলতে গেলে মিস কুক-এর স্কুলটাই ছিল সবেধন নীলমণি। ১৮৪০-এ বাংলায় যে পাঁচশত ছাত্রী লেখাপড়া করছে প্রতিষ্ঠানে তার অর্ধেকই ছিল মিস কুক-এর স্কুলে। পরে বেথুন সাহেব স্কুল দিলেন। জেনানা বাইবেল ও মেডিক্যাল মিশন খোলা হল ১৮৫২-তে। ১৮৬০-৬১-র ব্রিটিশ হোম ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে এ্যাংলো-ভার্নাকুলার বা ইংরেজি-বাংলা উভয়ভাষী স্কুল বাংলায় যথেষ্টই। ১৮৬৭-তে প্রকাশিত এ. এম. মনটিয়েথ-এর গ্রন্থে বাংলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের একটা বিশদ চিত্র পাচ্ছি। বাংলার বেশ কয়েকটি কলেজ-এর নাম তখন ছড়িয়েছে, যেমন, হুগলি কলেজ (১৮২৪), ফ্রি চার্চ ইন্সটিটিউশন (১৮৩০), জেনারেল এ্যাসেম্বলি'জ ইন্সটিটিউশন, সংস্কৃত কলেজ (১৮৩৬), ঢাকা কলেজ (১৮৪১), কৃষ্ণনগর কলেজ (১৮৪৬), বহরমপুর কলেজ (১৮৫৩), প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮৫৫), ডোভেটন কলেজ (১৮৫৫), সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (১৮৬০), পাটনা কলেজ (১৮৬২), ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ, কলকাতা (১৮৬৫) ইত্যাদি। আলাদাভাবে বাংলা অঞ্চলে মিশনারিদের সংখ্যাটাও বেশ উচ্চ। এদের সকলেই বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিল শিক্ষা বিষয়ে। ১৮৫২-র জানুয়ারি মাসে দেখা যাচ্ছে (বাংলায় মিশনারিদের কাজ সম্পর্কে জোসেফ মলেন্স-এর গ্রন্থ থেকে) বাংলা অঞ্চলে চার্চ মিশনারি সোসাইটি, ব্যাসলে মিশন, ওয়েসলিয়ান মিশনারি সোসাইটি, গসপেল প্রোপাগেশন সোসাইটি, ব্যাপ্টিস্ট মিশন, আমেরিকান বোর্ড, আমেরিকান প্রেস মিশনারি, লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি তৎপর। দশ বছর পরে ১৮৬২-তে বাংলায় মিশনারিদের ৭৪টি কেন্দ্র, ১১২টি উপকেন্দ্র, ১১৩টি বিদেশী পরিচালিত, ১৭টি স্থানীয়দের পরিচালিত মিশনের অধীনে ১২৯টি স্কুল, ২৩টি বোর্ডিং স্কুল, ২৯টি এ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল, মেয়েদের ৪০টি স্কুল এবং ২৫টি বোর্ডিং স্কুল ছিল। আর তখন প্রায় পঞ্চাশটি সোসাইটি মিশনারি কর্মে রত। এ সময়ের মধ্যে বাংলায় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের ৩টি সংস্করণ বেরিয়েছে, যার মধ্যে কেবল নিউ টেস্টামেন্টের মুদ্রণ হয়েছে ১১বার। এভাবে ১৮৭০-এ এসে পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলার যে চিত্র মিলছে তাতে দেখা যাচ্ছে বাংলার সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩০.৬% জমিদার-অভিজাত শ্রেণীর, ৮.৬% ব্যবসায়ী-বেনিয়া-দালাল শ্রেণীর, ৯.৬% পেশাজীবী শ্রেণীর, ৩১.৮% সরকারি চাকুরে ও পেনশনভোগী শ্রেণীর, ১.৩% দোকানদার শ্রেণীর এবং ১৮.১% অন্যান্য শ্রেণীর লোক। বেসরকারি বা প্রাইভেট যাতে মিশনারিরাও অন্তর্ভুক্ত, সেরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৬.৬% জমিদার-অভিজাত শ্রেণীর, ১৪.৪% ব্যবসায়ী-বেনিয়া-দালাল শ্রেণীর, ১১.২% পেশাজীবী শ্রেণীর, ২৩.২% সরকারি


www.pathagar.com

চাকুরে ও পেনশনভোগী শ্রেণীর, ১.৪% দোকানদার শ্রেণীর এবং ২৩.২% অন্যান্য শ্রেণীর লোক। দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার ৫০/৬০ বছরের প্রাতিষ্ঠানিকতায় সমাজের উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের মানুষেরই লাভ হয়েছে অধিক। নিম্ন-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের কাছে পৌঁছায়নি তাদের শিক্ষার অবদান। অবশ্য ব্রিটিশরা সেটা চায়ওনি। ১৮১৪-তে রেভারেন্ড এম থমাসন, ১৮১৫-য় লর্ড ময়রা, ১৮২২-১৮৩০ পর্যন্ত লর্ড এলফিনস্টোন, ১৮২৮-এ রেভারেন্ড ব্রাইস, ১৮৩৫-এ উইলয়ম এ্যাডাম—এঁরা সকলেই যে শিক্ষার পক্ষে ওকালতি করেন তা এককথায় জনশিক্ষা। ১৮৩৫-১৮৪৩ পর্যন্ত ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় বি এইচ হজসন যেসব রচনা লেখেন তাতে দেশীয় ভাষায় জ্ঞানশিক্ষা, নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, প্রশিক্ষিত শিক্ষক শ্রেণী গড়ে তোলা, ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেশীয় ভাষায় প্রচার প্রভৃতি প্রসঙ্গ উঠে আসে। হজসনের কথায়ও সাধারণ মানুষের জীবনচেতনাই প্রাধান্য পায়। কিন্তু ১৮৩৫-এ ম্যাকলে সাহেব জানালেন যে, না সকলের শিক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশদের নয়, তারা কেবল একটা শ্রেণীর সৃজন-অভিলাষী। ১৮৩৯-এ লর্ড অকল্যান্ড আসলে ম্যাকলের কথাটাকেই খানিকটা মিষ্টি প্রলেপে মাখিয়ে উপস্থাপন করলেন। তাঁর ধারণা, ব্রিটিশরা যদি একটি শ্রেণীকে ইংরেজি শিক্ষিত করে তোলে তাহলে সেই শিক্ষিত শ্রেণীটিই তাদের নিচে পড়ে থাকা শ্রেণীকে উদ্ধার করবে। বাস্তবে তা হয়নি ; ব্রিটিশ আমলেও না, পরেও না।

একথা সত্য যে বাংলায় মিশনারি তৎপরতাতেই প্রথম ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব উত্থাপিত হয়। বাইবেল ও ধর্মপ্রচার এবং খ্রিষ্টধর্মে দেশীয় মানুষেদের দীক্ষাদান বিষয়গুলোর সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল শিক্ষার। ধর্মীয় প্রচারের কারণেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে জোর উৎসাহ ছিল শিক্ষা নিয়ে। তাদের ধারণা ছিল মানুষকে খানিকটা জ্ঞান এবং শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলে একসময় তারা বরণ করে নেবে বাইবেলকেও। ধর্মান্তরের কিছু সাফল্য আসেও এবং সেই সফলতার অনুপ্রেরণাই তাদের উৎসাহ যোগায় অনন্তর। অল্প আগে যে মিশনারিদের তালিকা দেয়া হল তারা ধর্মদর্শন ও ধর্মপদ্ধতিতে পরস্পর পরস্পরের চাইতে কিছু পৃথক হলেও দেশীয়দের খ্রিষ্টধর্ম-দীক্ষা দেয়ার ব্যাপারে ছিল সমধর্মী। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ-আয়োজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি মিশনারিদের জন্যে নিয়ে এল নতুন জটিলতা। তারা দেখল শিক্ষার বিষয়টা আর একটেচিয়া তাদের হাতে থাকছে না। ফলে মিশনারি-সরকারি দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। ১৮৩৩-এ ম্যাকলে বলেছিলেন যে সনাতন ধর্মবিশ্বাসীরা শিক্ষিত হয়ে আর তাদের ধর্মে আবদ্ধ থাকেনি। তবু ম্যাকলে, লর্ড বেন্টিঙ্ক, লর্ড অকল্যান্ড, ট্রেভেলিয়ান প্রমুখ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সরকারি পরিকাঠামোয় ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের পক্ষে ছিলেন না। হয়ত শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের দেশীয় মানসে ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কিত সন্দেহ-সংশয়ের প্রতিপ্রেক্ষিতটিকে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছিলেন।


www.pathagar.com

তাঁরা হয়ত হিসেব করে দেখেন যে বিপুল মিশনারি তৎপরতার প্রতিপক্ষে ধর্মান্তরের পরিসংখ্যান উল্লেখ করবার মতো নয়। বরং যাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসন বজায় থাকতে পারে, যাতে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক শোষণে দেশীয় কলকব্জা আরো বেশি পরিমাণে কাজে লাগানো যায় এবং দীর্ঘকাল ব্যবস্থাটা টিকিয়ে রাখা যায় সেটাই কাম্য ছিল তাঁদের। কিন্তু দ্বন্দ্বটা বেশ প্রকাশ্য রূপ নিল। এদিকে ১৮৩৫-এ কলকাতার সাংবাদিকরা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ কালাকানুন (১৭৯৯-তে ওয়েলেসলি প্রবর্তিত) বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করলে চালর্স মেটকাফের নির্দেশে সেটা বাস্তবায়িত হয়। এতে ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ক প্রচারণার পক্ষে-বিপক্ষে মতামত প্রকাশ পেল বাড়তি গতি। ১৮৪০-এ ইংল্যান্ডে চালু হওয়া টেলিগ্রাফ ১৮৫১ তে পৌঁছাল ভারতবর্ষে। ১৮৬০-এ এল সাবমেরিন টেলিগ্রাফ এবং ১৮৬৫ তে ল্যান্ড টেলিগ্রাফ। ১৮৩৮-এ এশিয়াটিক জার্নালে প্রকাশিত কিছু রচনায় সরকারের কড়া সমালোচনা করা হয়। সমালোচনাকারীরা সম্ভবত মিশনপন্থী ছিলেন। তাঁরা স্পষ্ট বলেন যে এতদিন ভারতে থেকেও ব্রিটিশরা স্থানীয় সমাজে কোনো নির্দিষ্ট প্রভাব ফেলতে পারেনি। আরো বলা হয়, ব্রিটিশ সরকার জনগণের জন্যে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে, পরিবর্তন যে আসবে তেমন উদ্যোগও দেখা যায় না। এশিয়াটিক জার্নালের প্রতিধ্বনি ওঠে পরের বছর আরো স্পষ্টতায় ড. আলেকজান্ডার ডাফের কণ্ঠে। ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় মিশনারি শিক্ষার একজন প্রধান পুরুষ, ডাফ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আলেকজান্ডার ডাফ চেয়েছিলেন বাইবেলের বাণী এবং খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষাকে স্কুল-কলেজে প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে সমন্বিত করতে। সরকারি স্কুলে প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার যথার্থ প্রতিফলন না থাকার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি চার্চ মিশনারি সোসাইটি বিলাতের পার্লামেন্টে এ মর্মে দরখাস্ত করে যাতে সরকারি উদ্যোগে স্কুলে ক্রিশ্চিয়ানিটি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৪৪-এ লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে সকলের জন্যে বাধ্যতামূলক বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়। সেভাবেই বিভিন্ন স্কুলের পাস-ফেলের হিসেবের ওপর নির্ভর করে স্কুলসমূহে বার্ষিক অনুদানের বিষয়টি। মিশনারিরা পরীক্ষা সম্পর্কিত সরকারি কার্যক্রমকে সাদরে গ্রহণ করে না। কেননা, আর্থিক অনুদান এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দিকটি সরকারের তত্ত্বাবধানে চলে যাওয়ায় মিশনারিরা তাদের নিজেদের শক্তিহীনতাকে চিহ্নিত করল। ১৮৫২-তে আলেকজান্ডার ডাফ স্কুলসমূহে বাইবেলকে বাধ্যতামূলক করার প্রসঙ্গে ফের উচ্চকিত হন এবং 'অখ্রিষ্টান' ব্রিটিশ শিক্ষার অসারতাকে সমালোচনা করেন। ডাফ সরকারের সমালোচনায় ছিলেন ক্লান্তিহীন। ১৮৫৩-তে তিনি আবার বললেন যে, স্কুলগুলোতে যেসব পুস্তক পাঠ্য সেগুলো প্রকৃত শিক্ষার উপযোগী নয় এবং সরকার-অনুসৃত পরীক্ষা পদ্ধতিও সঠিক নয়। ডাফ-এর জোরের কারণ ছিল। শিক্ষা বিষয়টি সরকারের এখতিয়ারে চলে গেলেও তখনো মিশনারি স্কুলে


www.pathagar.com

লেখাপড়া করছে প্রচুর ছাত্রছাত্রী। ১৮৫৭ সালে হজসন প্র্যাট জানান যে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তখনো তাদের সন্তানদের মিশনারি স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে উৎসাহী। ১৮৫২/৫৩-তে শিক্ষা সম্পর্কিত মিশনারি-সরকারি দ্বন্দ্ব তুঙ্গে। ঐ বছরেই প্রকাশিত হয় হ্যানা ক্যাথারিন মলেন্সের উপাখ্যানগ্রন্থ 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। মিশনারিরা তখনো ধর্মীয় শিক্ষায় নিরলস এবং বিশ্বাস করত যে দেশীয়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য তারা অর্জন করতে পারবে। মিশনারি মলেন্সের গ্রন্থে সেই বাস্তবতার প্রতিফলন—

*"এক্ষণে পাঠকবর্গের প্রতি আমার একটা নিবেদন আছে। তোমরা যে সকল লোকদের ইতিহাস পড়িয়াছ, তাহারা তোমাদেরই দেশের লোক ; তোমাদের ন্যায় তাহারাও পূর্বে হিন্দু ছিল এবং তোমাদের আচার ব্যবহারও রীতিমতো তাহাদের আচার ব্যবহার ও রীতি ছিল, কিন্তু পশ্চাৎ তাহারা খ্রিষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিল।"*

পাঠে ধারণা জাগা স্বাভাবিক যে ভারতে বা বাংলায় প্রচুর লোক মিশনারিদের প্রচারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। বাস্তবে তা হয়নি। স্থানীয়রা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশনারিদের শিক্ষার দিকটাকে নিয়েছে, কিন্তু প্রচলিত ধর্মকে পরিত্যাগ না করে। যারাও বা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর হতদরিদ্র মানবগোষ্ঠী। 'নিউ ইন্ডিয়া'র রচয়িতা হেনরি কটন লিখেছেন যে তাঁর ১৮ বছরের বাংলায় কার্যকালীন অভিজ্ঞতায় তিনি একটিও অভিজাত মুসলমানকে ধর্মান্তরিত হতে দেখেননি। বেশির ভাগ নিম্নশ্রেণীর। বলাবাহুল্য সেই সংখ্যাটাও সমগ্রর তুলনায় নগণ্য। একই সঙ্গে একথাও বলা যায় সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা মিশনারি বা সরকারি কোনো শিক্ষাকেই সাদরে বরণ করেনি। ১৮৮১-৮২-তে বাংলার সামগ্রিক শিক্ষার্থীর মধ্যে মুসলমান ১৭% এবং ১৮৮৭-৮৮-তে তারা সমগ্রর ২৪%।

১৮৫৪-তে প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রথম সরকারি ভাষ্য যা চুয়ান্নর ডেসপ্যাচ নামে পরিচিত। এতে ভারতের এবং অবশ্যই বাংলার অর্ধশতকের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন ধরা পড়ে। ভাষ্যে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার জরিপ, স্কুল-কলেজে প্রচলিত শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, শিক্ষার ভবিষ্যৎ, শিক্ষা ও ধর্মের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য থাকে। ডেসপ্যাচের নির্যাস হল, সরকার কখনই ভারতবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করবে না। এমনকি তারা জোর করে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা দেবার পক্ষেও নয়। বস্তুত সরকারি শিক্ষাভাষ্যে বলা যায় মিশনারি কার্যে নিয়োজিত মিশনারিদের শিক্ষা তৎপরতার মূলে কুঠারাঘাত হানা হল। তবে মিশনারিদের জন্যে সান্ত্বনার বাণীও কিছু ছিল। এতে এ-ও বলা হয় যে ভারতের জনগণের মনোজগতে যেসব দেবদেবী ও ধর্মের ধারণা শেকড়গাড়া সেগুলোকে ধূলিস্যাৎ না করে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা দেয়া অসম্ভব।


www.pathagar.com

সামগ্রিকভাবে চুয়ান্নর ভাষ্যকে ঐতিহাসিক-সমালোচকগণ নিরপেক্ষ শিক্ষানীতির ধারক বলে মেনে নেন। সরকারের উক্ত শিক্ষানীতির প্রতিফলন ঘটে স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত-অনুসৃত নীতিমালায়। ইয়োরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে এবং স্কুলসমূহের বিভিন্ন পরীক্ষা ও ধাপ অতিক্রমকারী বার্ষিক পরীক্ষাসমূহে প্রণীত প্রশ্নপত্রে চুয়ান্নর শিক্ষাভাষ্যের প্রতিফলন লক্ষিত হতে থাকে। তথাপি দেশীয় চিন্তাধারা ও অভ্যেসকে সুযোগ পেলেই ব্রিটিশরা আক্রমণ করা থেকে সরে আসেনি। সরকার নিরপেক্ষ শিক্ষানীতির কথা বললেও আলাদা আলাদাভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমালোচনা অব্যাহত থাকে। এমনকি প্রকাশ্য সভাতেও সেটা চলতে থাকে। ১৮৭৯-তে মাইন্ডাম হলে একটি বক্তৃতায় ড. মারে মিচেল বলেন যে কলেজগুলোতে দুটো ধারা, একটা সনাতনী এবং অন্যটি ইয়োরোপীয়। সনাতনীদের সঙ্গে ইয়োরোপীয়দের চিন্তাজগতের আকাশ-পাতাল তফাৎ। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিজ্ঞানকে তিনি অদ্ভুতুড়ে বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে ছাত্ররা এসব বই পড়ে সঙ্গে-সঙ্গে এগুলো ঝেড়ে ফেলে এবং বইগুলোকেও তারা আর বিশ্বাস করতে পারে না। সনাতন ধারণা ছাত্রদের মনোজগতের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় বলে মারে উল্লেখ করেন। চুয়ান্নর শিক্ষাভাষ্যের পরও ধর্মশিক্ষা নিয়ে ওকালতি চলে যথেষ্ট। স্কুলে প্রার্থনা দিবস থাকবে কি থাকবে না, প্রার্থনায় সব শ্রেণীর ছাত্র উপস্থিত থাকবে কি থাকবে না, স্কুলে বাইবেলের ভূমিকা বা সমস্ত ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা কি হবে সেসব বিতর্কও চলে। ১৮৭৯-র অক্টোবর মাসে লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার হসপিটালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. সি ম্যাকনামারা বলেন যে, ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মকে ভেঙেচুরে এবং বদলে দিচ্ছে ক্রমান্বয়ে। এতদ্‌সত্ত্বেও ১৮৮২-র দ্বিতীয় সরকারি শিক্ষাভাষ্যে সরকার শিক্ষা বিষয়ে ধর্মীয় নিরপেক্ষতার নীতিতেই স্থির থাকে।

১৮৫৪-র ঐতিহাসিক শিক্ষাভাষ্য প্রকাশের বছরে ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা স্বাক্ষরিত একটি শিক্ষা প্রতিবেদন বা প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। বাংলায় স্কুলসমূহে গণমুখী ও নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রচলনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আহ্বান জানান তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাশা করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা প্রস্তাবটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রচলিত অবস্থাকে ঢেলে সাজাবার পক্ষপাতী। কেবল পাঠ্যসূচি নয়, স্কুল প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রক্রিয়ার সুষম বিকাশে অনুসরণযোগ্য বিভিন্ন পদক্ষেপও তিনি প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর প্রস্তাবিত শিক্ষাসূচির বিষয়সমূহ হল ভূগোল, ইতিহাস, জীবনী, গণিত, জ্যামিতি, দর্শন, নীতিকথা, রাজনৈতিক অর্থনীতি, শরীরবিদ্যা ইত্যাদি। এছাড়া প্রস্তুতিমূলকভাবে চালু হয়ে যেসব স্কুল তখনো সফলভাবে সক্রিয় সেসব স্কুলে অনুসৃত পাঠ্যসূচির


www.pathagar.com

উল্লেখ করেন তিনি। এতে পাঁচ খণ্ড শিশুকথা ; চেম্বারের শিক্ষাগ্রন্থ ; প্রাণীদের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ লীপাবশ্বি ; মার্শম্যান প্রণীত বাংলার ইতিহাস ; চারুপাঠ, জীবনচরিত পর্যায়ে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, স্যার উইলিয়াম হার্শেল, গ্রটিয়াস, লিনিয়াস, ডুভাল, স্যার উইলিয়ম জোন্স, থমাস জেনকিন্স প্রভৃতির জীবনী ; ভারত, গ্রিস, রোম ও ইংল্যান্ডের ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ্যপ্রস্তাব করা হয়। শিক্ষার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যাসাগর যে স্কুলের পরিকল্পনার কথা জানান তাতে শিক্ষক থাকবেন ২জন করে। একটি স্কুলে থাকবে ৩ থেকে ৫টি ক্লাস। শিক্ষকদের মাসিক বেতন হবে ২০-৩০ টাকা, হেড পণ্ডিতের বেতন ৫০ টাকা। হুগলি, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে সর্বমোট ২৫টি স্কুলের প্রস্তাব করেন তিনি। স্কুলগুলো শহরে বা গ্রামে এমন জায়গায় হতে হবে যেখানে কাছাকাছি ইংরেজি স্কুল বা কলেজ নেই। কেননা, স্কুলগুলোতে শিক্ষার বাহন হবে বাংলা ভাষা। সঙ্গত কারণেই ইংরেজি স্কুল সন্নিকটের দেশীয় ভাষার প্রতিষ্ঠানকে সুনজরে দেখবে না বলে জানান বিদ্যাসাগর। স্কুলসমূহের জন্যে দেড়শত টাকা মাসিক বেতনে সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিয়োগ দিতে হবে যিনি ভ্রমণ ভাতাও পাবেন। তাঁর কাজ হবে নিয়মিত স্কুলসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ। স্কুল, ক্লাস এবং স্কুলে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে পরিদর্শক তাঁর রিপোর্ট পেশ করবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা প্রস্তাবটি ঐতিহাসিক গুরুত্ববাহী। বাংলায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন এবং তা এমন এক সময়ে যখন মিশনারি-সরকারি দ্বন্দ্ব প্রকাশমান। তাছাড়া ব্রিটিশ শাসনাধীন এবং ব্রিটিশদের অর্থায়নে সাধনযোগ্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে যতটা সম্ভব দেশীয়দের উপকারে লাগানো যায় বিদ্যাসাগর সে চিন্তাই করেছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মীয় নিরপেক্ষতাকে বজায় রাখলেও সর্বসাধারণের জন্যে সে শিক্ষা সুফল বয়ে আনেনি। কারণ ভূমিসংস্কার, বাণিজ্য প্রক্রিয়া প্রভৃতি নির্ভর যে অর্থনীতি ও নিয়ন্ত্রণের উপনিবেশ সর্বগ্রাসী অবস্থায় ছিল তা বাংলার জনগণের সুষ্ঠু বিকাশের পথকে বাধাগ্রস্তই করেছিল। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষার একটি ফলিত রূপ পাওয়া যায়। সে ইতিহাস ভিন্ন। সে ইতিহাসে শাসক ব্রিটিশ অপসৃত হয় কিন্তু তাদের শিক্ষানীতির প্রাণ ভাবনার বিদায় হয় না। কারণ শিক্ষা তখনো এবং আরো পরে শ্রেণীনির্ভরই হয়ে থাকে। এটাও সত্য যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ই জন্ম দিয়েছে 'নবজাগরণ' যা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে—হয় প্রচুর। এই শিক্ষাই জন্ম দিয়েছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের, তুলনামূলকভাবে যা নিয়ে বিতর্ক হয় কম।


www.pathagar.com

# অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমি এবং কবি রামকিনু দত্ত

## প্রসঙ্গ : 'অ্যাংলো-ভারতীয়' এবং ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা

১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৬ (২) ধারায় সর্বপ্রথম 'অ্যাংলো-ভারতীয়' সম্পর্কে স্পষ্টভাবে সরকারি সংজ্ঞা দেয়া হয় :

> An 'Anglo-Indian' means a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent but who is domicile within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purposes only.[১]

ইংরেজ শাসনামলে ভারতীয় এবং ইংরেজ জাতির আন্তর্মেশামেশির ফলে জীববিদ্যাগতভাবে ভারতবর্ষে যে ধারার সূচনা ও বিকাশ ঘটেছিল তাকেই স্পষ্ট স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে উক্ত সংজ্ঞায়। 'অ্যাংলো-ভারতীয়'র বিশদতর সংজ্ঞা দিয়েছেন ডব্লু. টি রয় ; তিনি লিখেছেন যে অ্যাংলো-ভারতীয়—

> ...is a member of a group possessing a distinctive subculture whose characteristics are that all its members are christians of one denomination or another, speak English, wear European clothes on almost all occasions, have substantially European dietary habits though addicted to the fairly lavish use of Indian spices, are occupationally engaged in a restricted number of trades and professions, and are by and large endogamous.[২]

এসব সংজ্ঞার আলোকে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় এবং নাগরিকতার নিয়ম-অনুশাসনের দৃষ্টিতে অ্যাংলো-ভারতীয় প্রসঙ্গটি বেশ জটিল ও বহুমাত্রিক। কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে 'অ্যাংলো-ভারতীয়' প্রসঙ্গটি তত জটিল নয়। 'অ্যাংলো-


www.pathagar.com

ভারতীয়' সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একদিকে যেমন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করেও বহু ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় বিষয়বস্তু নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন তেমনি জন্মসূত্রে অ্যাংলো-ভারতীয় না হয়েও বহু ভারতীয় ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। এই উভয় প্রকারের লেখকদের মধ্যে তখন মিল একটাই—ভাষাগত। ভাষার এই মাপকাঠির কাছে জাতিগত, বর্ণগত প্রসঙ্গসমূহ গৌণতা লাভ করেছে।

এ কথা ইতিহাস খ্যাত যে, ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের শাসনামলে টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলের (১৮০০-১৮৫৯) সরকারি ঘোষণারও বহু আগে থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলেই ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক প্রচার শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কোম্পানির অনুমতি নিয়ে 'নেটিভ'দের মধ্যে একই সঙ্গে মিশনারি সেবাকর্ম ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়। এর ফলে গড়ে ওঠে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ম্যাকলের ঘোষণাটি যতই আকস্মিক মনে হোক না কেন এর একটি যৌক্তিক ভিত্তি না থাকলে তিনি এত দৃঢ়ভাবে তাঁর ঘোষণাটি প্রকাশ করতে পারতেন না। ম্যাকলের ১৮৩৫ সালের আনুষ্ঠানিক ঐতিহাসিক ঘোষণার দিন থেকে খানিকটা পেছনে দৃকপাত করা যাক। ১৮১৩ সালের ৩ জুন বৃহস্পতিবার ব্রিটেনের কমন্স সভায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিষয় আলোচনার পর গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় :

> That is the opinion of this committee, that it is the duty of this country to promote the interest and happiness of the native inhabitants of the British dominions in India, and that such measures ought to be adopted, as may tend to the introduction among them of useful knowledge, and of religious and moral improvement. That, in the furtherance of the above objects, sufficient facilities shall be afforded by law, to persons desirous of going to, and remaining in India for the purpose of accomplishing those benevolent designs.[৩]

১৮১৩ সালের এই ঘোষণায় ব্রিটেনের হাউস অব কমন্সের যে দৃঢ়তা প্রকাশ পায় তারও ভিত্তি ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ও ইয়োরোপীয় তৎপরতায় স্থাপিত নানা প্রতিষ্ঠান যেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয়দের মধ্যে বাইবেলের বাণী প্রচার এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো।

রেভারেন্ড জেমস লং-এর একটি গ্রন্থ[৪] থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবর্ষে খ্রিষ্টীয় জ্ঞান প্রচারের জন্যে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় ১৭১১ সালে মাদ্রাজে। 'সোসাইটি ফর প্রোমোটিং ক্রিশ্চিয়ান নলেজ' নামের এই প্রতিষ্ঠানটিই


www.pathagar.com

প্রথম লর্ড ক্লাইভের শাসনামলে বাংলার প্রথম প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারি হিসেবে পাঠান রেভারেন্ড জাকারিয়া কিয়েরনানদারকে[৫]। ১৭৩১ সালে এই প্রতিষ্ঠানেরই উদ্যোগে একটি দাতব্য বিদ্যালয় চালু হয়েছিল যেখানে ছাত্রদের ইউনিফর্ম পরে ক্লাসে যেতে হত। উল্লেখ্য যে, 'Blue coat school in London'-এর ছাত্রদের ইউনিফর্মের অনুকরণে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইউনিফর্ম চালু করা হয়।[৬]

১৮১৮ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি।[৭] এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতবর্ষে বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে পালন করে সমন্বয়কারীর ভূমিকা। নেটিভদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করেছিল। ১৮২৪ সালে প্রকাশিত চার্লস্ লুসিংটনের গ্রন্থের পরিশিষ্টে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক পরিবেশিত বইয়ের যে তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে সংস্কৃত, হিন্দুস্তানি, ওড়িয়া, আরবি ইত্যাদি ভাষার গ্রন্থের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও জ্ঞান বিষয়ক প্রচুর গ্রন্থ লক্ষণীয়। এগুলোর রচয়িতা ছিলেন ইয়েটস, কিথ, স্টুয়ার্ট, পিয়ার্সন, হেয়ার, মে, লসন, রো, বেল, মারে, রিকেট প্রমুখ। বলাবাহুল্য, এসব গ্রন্থে ইয়োরোপীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধের যে প্রকাশ ছিল তা ভারতবর্ষের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক দিগন্ত উন্মোচনকারী। ১৮১৯ সালে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (প্রতিষ্ঠিত ১৮১৮) কলকাতায় স্থানীয় ভাষানির্ভর কয়েকটি বিদ্যালয় চালু করে। সেগুলোর সুপারন্টেন্ডেন্টকে স্কুল সোসাইটি পাঁচ মাসের জন্যে বর্ধমানে পাঠান সেখানে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্কুলগুলোর মধ্যে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি জেনে আসতে।[৮] কাজেই দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশরা অল্প বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার যে মডেলটির বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ অভারতীয় তথা ব্রিটিশ ধরনের।

এর পাশাপাশি কলকাতার 'অক্সিলারি চার্চ মিশন সোসাইটি'র রিপোর্টের উল্লেখ করা যায়, যেখানে বিদেশীগণ কর্তৃক ভারতবর্ষে যিশুখ্রিষ্টের পবিত্র বার্তা প্রচারের কাজে তাঁদের সাফল্যের কথা প্রচারিত। এই রিপোর্টটিতে বাইবেলের উদ্ধৃতিসহ মিশনারিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

> Our great object being, to convince those who are in error, and to turn them by the persuasive power of truth, "from darkness to light, and from the power of satan to God".[৯]

বস্তুত ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মূল্যবোধটাই এক নতুন কৃষ্টির সূচনা করেছিল। পরবর্তীকালে 'নেটিভ'দের মধ্যে ইংরেজ প্রবর্তিত এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিই আগ্রহ বেড়ে যায়। এতে


www.pathagar.com

জ্ঞানার্জনের আগ্রহ বা চাকরি লাভের আকাঙ্ক্ষা কোনটি বেশি ছিল সে বিষয়ে তর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতি ভারতবর্ষে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিল। ১৮৩৫ সালে ম্যাকলে তাঁর বিখ্যাত মিনিটে ইংরেজিকে চালু করার যে প্রস্তাব করেন তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ইউলিয়ম বেন্টিঙ্ক (গভর্নর জেনারেল হিসেবে কর্মরত ১৮২৫-৩৫) : 'I give my entire concurrence to the sentiments expressed in this minute.'[১০]। এভাবেই ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার পথ প্রশস্ততা লাভ করে এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের পরিচর্যায় তা অনুকূল রেখায় বিকশিত হয়। ১৮৫৪ সালের শিক্ষা বিষয়ক বার্তাকে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলা হয়েছে। কেননা,

> It imposed on the Government of India the duty of creating a properly articulated system of education, from the primary school to the University.[১১]

১৭৫৮ সালে লর্ড ক্লাইভের আমন্ত্রণক্রমে ডেনিশ পাদ্রি রেভারেন্ড কিয়েরনানদার যখন কলকাতা পৌঁছান সেই সময়কার কলকাতার বর্ণনা প্রসঙ্গে রেভারেন্ড জেমস লং লিখেছেন[১২] যে তখন সতীদাহ প্রথার রমরমা, স্বর্গসুখের আশায় আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে জ্বলে মরছে নারীগণ ; নগ্ন সন্ন্যাসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে কলকাতার রাস্তায়, তাদের ২/৩ ফুট লম্বা চুলে জটাজট ভর্তি ; কেউ কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে শরীরে গোবর মেখে। কলকাতার রাস্তায় ইয়োরোপীয়র সঙ্গে দেখা হলে তারা পরে শরীরের বস্ত্রাদি ধুয়ে ফেলে তার প্রায়শ্চিত্ত করত। এহেন কলকাতাই কালক্রমে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির সম্মিলনে এক নতুন নাগরিকতার প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসেও এই কলকাতারই প্রাধান্য।

বস্তুত এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবর্ষে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তারের সামগ্রিক খতিয়ান তুলে ধরা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, সারা ভারতে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ব্রিটিশরা প্রচুর সংখ্যক বিদ্যালয়, হাসপাতাল, দাতব্য সংস্থা গড়ে তুলেছিল। এর ফলে ভাতরবর্ষে পাশ্চাত্য প্রভাবের উৎসমুখ উন্মুক্ত হয়ে যায়। অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় এই প্রভাবের পটভূমিটিও তাই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।


www.pathagar.com

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লেখক এবং অ-ভারতীয় ব্রিটিশ লেখকদের অবদানে এই ধারা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন এডোয়ার্ড ফার্লে ওটেন। ১৭৮৩ সালকে তিনি অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করেন—

> Anglo-Indian literature may be said to have been born in 1783, the year of the arrival in India of Sir William Jones, the great orientalist, who became the first Anglo-Indian poet.[১৩]

ইংল্যান্ডে থাকাকালেই উইলিয়ম জোনস প্রাচ্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং ভারত বিষয়ে কয়েকটি কবিতা রচনা করেন ভারতে এসে। তিনি 'The Enchanted Fruit', 'Hindu Wife' প্রভৃতি মৌলিক কবিতা ছাড়াও সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি থেকে বহু গ্রন্থের অনুবাদ করেন।[১৪] পরবর্তীকালে কবিত্বের পরিচয় ছাপিয়ে জোনসের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হিসেবে।

ওটেনের গ্রন্থটিতে মূলত ইংরেজিভাষী ও অ-ভারতীয় অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যিকদের রচিত কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাস, ব্যঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রধান ও অপ্রধান লেখকদের রচনাসমূহ অবলম্বনে তিনি অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর গ্রন্থে আলোচিত প্রধান প্রধান অ্যাংলো-ভারতীয় লেখকগণ হলেন—জন লেডেন, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, বিশপ হেবের, ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন, জর্জ পাওয়েল থমাস, জে.বি. নর্টন, আলফ্রেড লায়াল, রুডইয়ার্ড কিপলিং, হেনরি মেরিডিথ পার্কার, এডউইন আর্নল্ড, ডব্লু. টি. পিয়ারসি, এলিফ চিম, টি. এফ বিগনোল্ড, ই.এইচ অ্যাটকেন, ইলটুডস প্রিচার্ড, মিডোজ টেলর, এইচ.এস ক্যানিংহ্যাম, জন লং, জি.বি. ফ্রেজার ও আর. ডব্লু. ফ্রেজার। এছাড়া ওটেনের গ্রন্থে কয়েকজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যিকের নামোল্লেখ আছে কিন্তু গ্রন্থকার তাঁদের সাহিত্যের কোনো মূল্যায়ন করেননি। এই লেখকগণ হলেন—এইচ. বিজয়চাঁদ দত্ত, জি.সি দত্ত, শশীচন্দ্র দত্ত, তরু দত্ত, পি. সি. মিত্র, লাল মনোকর, ভেসুভালা সি নওরোজি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রামস্বামী রাজু।

অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের ধারায় ভারতীয় লেখকদের অবদান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষীয় যে লেখক প্রথম অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের লেখক হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃত তিনি একজন বাঙালি—কাশীপ্রসাদ ঘোষ।[১৫] ডানের গ্রন্থে অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যে বাঙালি লেখকদের অবদানকে


www.pathagar.com

গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। ডান জানাচ্ছেন যে ১৮৩০ সালে প্রকাশিত কাশীপ্রসাদ ঘোষের[১৬] প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'The Shair and other poems'-ই প্রথম গ্রন্থ যা কোনো ভারতীয় রচিত প্রথম অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের নিদর্শন। বাঙালি কাশীপ্রসাদ ঘোষের গ্রন্থটি সম্পর্কে ডান আরো জানাচ্ছেন—

> The book was a substantial one of about two hundred pages, throughly well printed by the India Gazette press, and dedicated to Lord William Bentinck. The influence of Sir Walter Scott is apparent in this work, the various Cantos of which are separtely dedicated to such famous contemporaries as Horace Hayman Wilson and Henry Meredith Parker.[১৭]

রেভারেন্ড জেমস লং তাঁর 'Handbook of Bengal Missions' গ্রন্থে 'Autobiography of Kasiprasad Ghose'[১৮] শিরোনামে কাশীপ্রসাদ ঘোষের নিজের লেখা যে জীবনী সংযোজন করেন তাতে একদিকে যেমন এই অ্যাংলো-বাঙালি কবির সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায় তেমনি অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমি সম্পর্কেও অনেক কিছু অবহিত হওয়া যায়। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজি বা বাংলা কিছুই তেমন পড়তে জানতেন না। ১৮২১ সালে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পান একজন Free Scholar হিসেবে। এর ছয় বছর পরে ১৮২৭ সালে বিখ্যাত পণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন হিন্দু কলেজ পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি ছাত্রদের ইংরেজি কবিতা রচনার ক্ষমতা যাচাই করে দেখতে চান। ঐ শ্রেণীতে একমাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষই ইংরেজিতে কবিতা লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর মেধা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার পরিচয় পেয়ে উইলসন তাঁকে বিভিন্ন রচনায় উৎসাহিত করেন। ইতঃপূর্বে ১৬-সংখ্যক পাদটীকায় কাশীপ্রসাদের সেই রচনাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ১৮২৯ সালে জেমস লং সম্পাদিত 'লিটারেরি গেজেট' ও 'ক্যালকাটা মানথলি ম্যাগাজিন' পত্রিকায় বাংলা কবিতা, রণজিৎ সিংহ, অযোধ্যার রাজা প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ ও আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। কাশীপ্রসাদের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় আরেকটি ঘটনায়। উইলিয়ম কেরী প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮৩১ সালে নিউ টেস্টামেন্টের যে বঙ্গানুবাদটি প্রকাশের জন্যে প্রস্তুত করা হয় তার অনুবাদের গুণাগুণ যাচাই করে সে সম্পর্কে মতামত দেয়ার জন্যে পাঠানো হয়েছিল কাশীপ্রসাদ ঘোষের নিকটে।

নিজের সাহিত্যজীবন, মাতৃভাষা বাংলা ও ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য সম্পর্কে অ্যাংলো-বাঙালি কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :


www.pathagar.com

I have composed songs in Bengali, but the greatest portions of my writings in verse is in English. I have always found it easier to express my sentiments in that Language than in Bengali, but whether it is because I prefer the associations, sentiments, and thoughts which are to be found in English poems to those that are met with in Bengali poetry, I cannot decide. I can only say that I have bestowed more time and attention upon English books than any others.[১৯]

বাঙালি হয়েও কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাংলার চাইতে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চাকে তাঁর নিজের জন্যে স্বতঃস্ফূর্ততর মনে করেছিলেন। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান প্রতিষ্ঠানগত যতটা নয় তার চাইতে বেশি স্বোপার্জনগত। এ প্রসঙ্গে টি. ও. ডি ডানের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য। তার মতে[২০] কাশীপ্রসাদ ঘোষের ইংরেজি ভাষার কবি হিসেবে আবির্ভাব ম্যাকলের মিনিটের পাঁচ বছর আগেকার ঘটনা এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'দি ক্যাপটিভ লেডি' রচনা করেন ১৮৪৯ সালে। অর্থাৎ ডান বলতে চেয়েছেন, এই দুজন অ্যাংলো-বাঙালি কবির শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি উৎসাহের ভিত্তি রচিত হয়েছে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই।

সমালোচক ডান উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির পরিবর্তে বিভিন্ন ব্যক্তির অবদানকে অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে নেপথ্য শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় তিনি উইলিয়ম জোনস, হোরেস হেম্যান উইলসন, জন লেডেন, বিশপ হেবের, হেনরি মেরিডিথ পার্কার, ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন, স্যার এডইউন আর্নল্ড প্রমুখের নামোল্লেখ করেন যাঁরা ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার যুবক সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যকর্মের দিকে উৎসাহী করে তুলেছিলেন।

প্রথম অ্যাংলো-ভারতীয় কবি যেমন একজন বাঙালি তেমনি অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম সংকলনটিও বাঙালি কর্তৃকই প্রকাশিত। এটি ১৮৭০ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। নাম—'The Dutt Family Album'[২১]। ২১০ পৃষ্ঠার উক্ত গ্রন্থে কবিতা সংখ্যা ১৯৭। মোট চারজন কবির কবিতা স্থান পেয়েছে এতে—গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, গিরীশচন্দ্র দত্ত ও হরচন্দ্র দত্ত।[২২] এঁদের মধ্যে তিনজনই ছিলেন হিন্দু কলেজের সেক্রেটারি এবং এঁরা একটি কোর্টের কমিশনার শ্রী রসময় দত্তের সন্তান।[২৩] কলকাতার একটি নামকরা কায়স্থ পরিবার ছিল উক্ত রামবাগানের দত্ত পরিবার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে নীলমণি দত্ত ছিলেন কলকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক। তাঁর সন্তান রসময় দত্তও


www.pathagar.com

খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কর্মজীবনে। তাঁর সর্বমোট পাঁচটি সন্তান ছিল—কৃষ্ণ, কৈলাশ, গোবিন্দ, হর ও গিরীশচন্দ্র দত্ত। শেষোক্ত তিনজন ও তাদের ভাইপো উমেশচন্দ্র দত্ত—এই চারজন উক্ত 'Album' সংকলনের কবি। কলেজে পাঠরত অবস্থায় এই কবিদের সাহিত্য রুচির বিকাশে প্রভাবিত করেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন। পিতার মৃত্যুর পরে দত্ত ভ্রাতাগণ তাঁদের আরেক চাচাতো ভাই শশীচন্দ্র দত্ত সহ একত্রে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।[২৪] উক্ত গ্রন্থের ভূমিকাটি অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক দলিল বিশেষ। ১৮৭০ সালের ১৩ জানুয়ারি রচিত উক্ত ভূমিকায় বলা হয়েছে যে,

> The Writers of the following pages are aware that bad poetry is intolerable, and that mediocre poetry deserves perhaps even a harsher epithet. There is a glut of both in the market. But they venture on publication, not because they think their verses good, but in the hope that their book will be regarded, in some respects, as a curiosity. They are foreigners, natives of India, of different ages, and in different walks of life, yet of one family, in whom the ties of blood relationship have been drawn closer by the holy bond of Christian brotherhood. As foreigners educated out of England, they solicit the indulgence of British critics to poems which on these grounds alone may, it is hoped, have some title to their education.[২৫]

এই গ্রন্থটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা যোগসূত্র হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, কবিদের কেউ কখনো ইংল্যান্ড যাননি। স্বদেশে বসে তাঁরা কবিতা রচনা করেছেন বিদেশী ভাষায়। তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে ইংরেজিভাষী সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণেরও চেষ্টা করেন। খ্রিষ্টীয় ধর্মের মহিমার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা সহজ যে, গ্রন্থভুক্ত কবিরা খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে খ্রিষ্টীয় ধর্মবিষয়ক অল্প কয়েকটি কবিতা বাদ দিলে গ্রন্থভুক্ত অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু পুরাণ, প্রকৃতি, প্রেম, ইতিহাস, সমাজ, বিদেশী সাহিত্য। পাশ্চাত্যের সমালোচক অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্য সংকলনটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন যে,

> ..it is a work of great interest and value. ... This first anthology of English verse written by Bengalis claims consideration as a curiosity and as work of foreigners educated out of England.[২৬]


www.pathagar.com

অন্যদিকে একই সংকলন গ্রন্থ সম্পর্কে বাঙালি সমালোচক লিখেছেন :

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উপরোক্ত কাউকেই ভারতীয় কবি বলা যায় না। বিলেতে না গেলেও এঁরা ছিলেন মনে-প্রাণে সাহেব, ভারতকে দেখেছেন ইংরেজের চোখ দিয়ে—অন্তত দেখবার প্রয়াস পেয়েছেন প্রাণপণ। ফলে, এঁদের কবিতা না ভারতীয় না ইংরেজ কারোই মনোহরণ করতে পারে নি। ভারতীয় মন, দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণার স্বাক্ষর অনুপস্থিত এঁদের কবিতায়।[২৭]

তবে গ্রন্থভুক্ত বেশ কয়েকটি কবিতায় এই বাঙালি কবি-চতুষ্টয়ের কবিত্বশক্তি ও ছন্দকুশলতা প্রকাশ পেয়েছে।

'The Dutt Family Album' গ্রন্থের চারজন কবির মধ্যে তিনজনের স্বতন্ত্র ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল : হরচন্দ্র দত্তের 'Fugitive Pieces' ১৮৫১ সালে ও গিরীশচন্দ্র দত্তের 'Cherry Blossoms' ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। গোবিন্দচন্দ্র দত্তের 'Farewell to Romance' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল জানা যায়নি।[২৮]

লতিকা বসু রচিত 'Indian Writers of English Verse'[২৯] গ্রন্থ থেকে উক্ত অ্যাংলো-বাঙালি কবিদের সম্পর্কে আরো তথ্য জানা যায়। ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে 'Calcutta Review' পত্রিকায় কবি গোবিন্দচন্দ্রের দ্বিতীয় চাচাতো ভাই রমেশ দত্ত তাঁর উপর একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। উক্ত প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ও সংস্কৃতিমনা খ্রিষ্টান। ধর্মীয় বিষয়ে অধ্যয়ন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কিত লেখাপড়াই ছিল তাঁর মূল মনোযোগের বিষয়। তাঁর দুই কন্যা অরু ও তরু দত্ত পরবর্তীকালে পিতার খ্যাতির সীমাকে ছাড়িয়ে নিজেরাও খ্যাতির চূড়ায় পৌছান ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় কাব্য-উপন্যাস রচনার দ্বারা। হরচন্দ্র দত্ত ছিলেন 'Bengal Magazine' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। পূর্বোল্লিখিত কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও তাঁর আরো দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—'Writings Spiritual and Moral' ও 'Heart Experiences or Thougts of Each Day'। তাঁর একমাত্র কাব্য গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয় 'Lotus Leaves' নামে। ১৮৭০ সালে 'Album' প্রকাশিত হওয়ার সতেরো বছর পরে গিরীশচন্দ্র দত্ত ইংল্যান্ডে যান এবং তাঁর কাব্যগ্রন্থটি ১৮৮৭ সালে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি সনেট ও গীতিকবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। উমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি ও জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মূল ফরাসি ও জার্মানিতে যেমন কবিতা রচনা করেন তেমনি উক্ত ভাষা দুটি থেকে ইংরেজিতেও কাব্যানুবাদ করেছেন। 'The Dutt Family Album'-এর কবিদের চাচাতো ভাই শশীচন্দ্র দত্তও ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনিও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪৮ সালে কলকাতা থেকে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'Miscellaneous Poems' প্রকাশিত


www.pathagar.com

হয়। ১৮৭৮ সালে বেশ কিছু নতুন কবিতাসহ এই গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয় 'The Vision of Sumeru and Other Poems' নামে।

'The Dutt Family Album' সংকলনটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হলেও এর কবিরা ভারতে বসেই কাব্যচর্চা করেছিলেন। এরপর থেকে দেখা যায় অনেকেই উচ্চ শিক্ষার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে পাড়ি জমিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। পাশ্চাত্যের পরিবেশ, ভিন্নধর্মী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রাচ্যের এই কবিদের সাহিত্য রুচিকে অনেকক্ষেত্রেই আমূল বদলে দেয়। বস্তুত ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই প্রতিফলন অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

কলকাতার রামবাগানের দত্ত পরিবারের আরেক সদস্য রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৪৮ সালের ১৩ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল ও কলেজে অসাধারণ মেধার ছাপ রেখে ১৮৬৮ সালে প্রায় বিশ বছর বয়সে তিনি ইংল্যান্ড গমন করেন এবং লন্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণার্থে ভর্তি হন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অত্যন্ত ভালো ফল করেন তিনি। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের কৃষকদের উপর গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইতিহাস, অর্থনীতি, সাহিত্য সর্বত্র তাঁর বিচরণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ১৮৯৪ সালে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত প্রকাশক কীগান পল তাঁর 'Lays of ancient India' এবং 'মহাভারত' ও 'রামায়ণের' অনুবাদ প্রকাশ করে। এগুলো মূলত ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যের অনুবাদ হলেও এতে রমেশচন্দ্র দত্তের সৃজনশীলতা ও মৌলিকতার পরিচয় আছে। অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিও উল্লেখ্য।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে ইংল্যান্ডে গমন করেন তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭)। ইংরেজি ও ফরাসি ক্লাসিক সাহিত্য বিষয়ে তিনি লেখাপড়া করেন। এর ফলে তাঁর মানসে পুরোপুরি সাহিত্যকেন্দ্রিকতা সৃষ্টি হয় এবং তিনি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় সাহিত্য রচনায় ও অনুবাদে পারঙ্গমতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। মাত্র ২১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করায় তাঁর সাহিত্যিক মেধার খুব সামান্যই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। তরু দত্ত রচিত ফরাসি উপন্যাস 'ল জুর্নাল দ্য মাদ্‌মোয়াজেল দ্য আরভ্যার' ও ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ 'Ancient Ballads and Legends of Hindustan' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে যথাক্রমে ১৮৭৯ ও ১৮৮২ সালে।[৩০]

সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিজ্ঞানে এডিনবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। তিনি হায়দ্রাবাদে নিজাম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[৩১] শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অত্যন্ত রুচিবান এই পরিবারের সদস্য সরোজিনী নাইডু বিজ্ঞানী বা গাণিতিক হবেন বলেই তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল। ১১ বছর বয়সে একদিন অ্যালজেব্রা করতে করতে যখন উত্তর মিলছিল না হঠাৎ অঙ্কের পরিবর্তে একটি কবিতা রচনা করে ফেলেন নাইডু। সেই দিন থেকেই শুরু তাঁর কাব্যজীবন। ১৩


www.pathagar.com

বছর বয়সে ছয় দিনে তেরোশ লাইনের কবিতা 'Lady of the Lake' রচনা করেন তিনি।[৩২] মাত্র ১৬ বছর বয়সে তরু দত্তের মতন নাইডুকেও বিদেশে গমন করতে হয় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে। ১৮৯৫ সালে হায়দ্রাবাদের নিজামের বিশেষ বৃত্তি নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে যান।[৩৩] ইংল্যান্ডে তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সম্পূর্ণ নিবেদিত হয়ে পড়েন, পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যচর্চাও অব্যাহত থাকে। উপন্যাস, জার্নাল, কবিতা সবক্ষেত্রেই তাঁর বিচরণ ছিল —কিন্তু কবি হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো 'The Golden Threshold', 'Bird of Time', 'The Broken wing'.

ডা. কে. ডি ঘোষের দুই সন্তান মনোমোহন ঘোষ ও অরবিন্দ ঘোষ উভয়েই ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চা করে যশ অর্জন করেন। দার্জিলিং এবং 'লোরেটো কনভেন্ট স্কুল' ; ম্যাঞ্চেস্টারের গ্রামার স্কুল এবং অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করে মনোমোহন ঘোষ গ্রিক ও ইয়োরোপীয় সাহিত্যে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন।[৩৪] তাঁর ভাই অরবিন্দ ঘোষও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। মনোমোহন ঘোষের গ্রন্থগুলো 'Primavera' (চারজন কবির কবিতা), 'Love Songs and Elegies', 'Songs of Love and Death', 'The Garland' (কয়েকজন কবির কবিতা)। অরবিন্দ ঘোষ কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও পরবর্তীকালে বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো—'Songs of Myrtilla', 'Baji Prabhou', 'Love and Death', 'The Hero and the Nymph' (সংস্কৃত থেকে অনুবাদ)।

অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যে আরো যে সব কবি অবদান রেখেছিলেন সংক্ষেপে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। রাজনারায়ণ দত্তের 'Osmyn' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৪১ সালে। নবকৃষ্ণ ঘোষ (রামশর্মা ছদ্মনামে লিখতেন)-এর কাব্য গ্রন্থ 'The Collected Poems of Ram Sharma' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। হায়দ্রাবাদের কবি নিজামত জং-এর সনেট সংকলন 'Love's Withered Leaves', রবি দত্তের কাব্যগ্রন্থ 'Poems, Pictures and Songs, পাঞ্জাবি কবি মানিকরাম থাডানির 'The Triumph of Delhi and Other Poems' ও 'Krishna's Flute', মাদ্রাজি কবি পি. শেষাদ্রির সনেটগ্রন্থ 'Vanished Hours' ; হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'Abu Hussain', 'The Feast of Youth', 'The Magic Tree', 'Perfume of Earth', 'Grey Clouds and White Showers' প্রভৃতি অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।


www.pathagar.com

## চট্টগ্রামের প্রথম অ্যাংলো-বাঙালি কবি রামকিনু দত্ত

আমাদের আলোচ্য কবি রামকিনু দত্তের কাব্যগ্রন্থের নাম 'Songs with Native Tunes of Different Sorts and Dances' সংক্ষেপে 'Songs'। ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে বর্তমানে এটির দ্বিতীয় সংস্করণটি রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদ থেকে জানা যায় গ্রন্থটির রচয়িতা Baboo Ramkinoo Dutt, পেশায় যিনি ছিলেন একজন সরকারি ডাক্তার ; দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকালে তিনি একজন Retired Medical Officer on Pension। এই সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে ; মুদ্রণকারী C. S. Press এর পক্ষে G.C.K. Chowdhury। ৪"×৮" সাইজের গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা সর্বমোট ৪২। গ্রন্থটি সাধারণ ডিমাই কাগজে মুদ্রিত। এটি এখনো অক্ষত অবস্থায় আছে, কোথাও কীটদষ্ট হয়নি।

গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় কবি জানাচ্ছেন :

> Reprinted, with fresh poems, under request reached from gentlemen of ranks and ladies of honour both England and India.
>
> The Editor of "Englishman" had been good enough to encourage the author by publishing many of the songs in the Englishman Vol II of June 1864: and reviewing the same favourably for which the author is highly grateful.

'Songs' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ যেহেতু পাওয়া যায়নি এবং দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম মুদ্রণের সঠিক তারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি সেহেতু এর প্রথম মুদ্রণের তারিখটি একান্তই অনুমানের উপর নির্ভরশীল। উপর্যুক্ত ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, ১৮৬৪ সালের জুন মাসে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় রামকিনু দত্তের উক্ত গ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা এবং গ্রন্থটিরও একটি আলোচনা ছাপা হয়েছিল। সে হিসেবে 'Songs'-এর প্রথম সংস্করণ হয়ত বা ১৮৬৪ সালের গোড়ার দিকে কোনো এক সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৩০ সালে প্রথম অ্যাংলো-বাঙালি তথা অ্যাংলো-ভারতীয় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রায় ৩৪ বছর পর এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য অ্যাংলো-বাঙালি কবিদের প্রথম কাব্য সংকলন লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় রামকিনু দত্তের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ছয় বছর পরে। আর এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে রামকিনু দত্তের পূর্ববর্তী এমন কোনো কবির সন্ধান


www.pathagar.com

পাওয়া যায়নি যাঁর ইংরেজি ভাষায় কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। কাজেই আমাদের বিচারে রামকিনু দত্তই চট্টগ্রামের প্রথম অ্যাংলো-বাঙালি কবি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ পর্যন্ত অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের যে সব সংগ্রহ গ্রন্থ (Anthology) প্রকাশিত হয়েছে তন্মধ্যে কোথাও রামকিনু দত্তের সাহিত্যকর্মের নিদর্শন কিংবা নামোল্লেখ নেই। অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের মূল্যায়ন ও ইতিহাস বিষয়ক কোনো গ্রন্থেও এই কবির নাম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় এক শত তেতাল্লিশ বছর পূর্বে ইংরেজি ভাষায় তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও তাঁর নামটি ইতিহাসে প্রায় চাপাই পড়ে গিয়েছে বলা চলে।

রামকিনু দত্তের কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে তাঁর জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। রামকিনু দত্ত চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা গ্রামের এক অভিজাত ও বিত্তবান দত্ত পরিবারে ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৫] তাঁর পিতার নাম সদয়রাম দত্ত। আনোয়ারা গ্রামের এই বিশিষ্ট দত্ত-পরিবার সম্পর্কে মনীন্দ্রভূষণ দত্ত লিখেছেন,

> *দত্ত পরিবার আন্দাজ ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে হুগলী জেলা হইতে মুসলমান সেনাবাহিনীর সহিত এতদ্দেশে (চট্টগ্রামে) আগমন করেন এবং আরাকান রাজের সহিত যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় এই জেলার 'ভূর্ষি' গ্রামে জায়গীর প্রাপ্ত হন এবং তদবধি এই দত্ত পরিবার এতদঞ্চলেই থাকিয়া যান।*[৩৬]

ভূর্ষি গ্রামের নিকটেই অবস্থিত আনোয়ারা গ্রাম। কালক্রমে এই দত্ত বংশের কোনো পুরুষ আনোয়ারায় এসে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে জমিদাররূপে পরিগণিত হন।[৩৭]

রামকিনু দত্তের জীবনী সম্পর্কে যথেষ্ট জানা না গেলেও এটুকু জানা যায় যে, "অসামান্য তেজস্বিতা, আত্মসম্মানবোধ ও লোকহিতৈষণার"[৩৮] জন্য তিনি সমগ্র চট্টগ্রাম জেলাতেই বিশেষ জনপ্রিয় ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। পেশায় তিনি সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের চাকুরে ছিলেন বলে সাধারণ্যে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল 'নেটিভ ডাক্তার' হিসেবে।[৩৯] রামকিনু দত্ত উর্দু ও ইংরেজি ভাষাতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং এই উভয় ভাষাতেই প্রচুর গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন।[৪০] উর্দু ও ইংরেজি ভাষাতে পারদর্শিতা সত্ত্বেও মাতৃভাষা ও স্বদেশের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। প্রখর আত্মসম্মানবোধ ও স্বাধীনচিত্ততার জন্যে রামকিনু দত্তকে ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। এ বিষয়ে ড. প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের বিবরণে রামকিনু দত্তের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।—

> চট্টগ্রাম থেকে অম্বিকাচরণ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত ১৩৪২ সালে 'শারদীয় পাঞ্চজন্য' পত্রিকায় জমি-জরীপ কার্যে বাধা দেওয়ার জন্য ১৮৩৭


www.pathagar.com

সালে ডাঃ রামকিনু দত্তের এক বৎসর কারাবাসের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সালটি সম্ভবত ছাপার ভুলে ১৮৪৭-এর স্থলে ১৮৩৭ হয়েছে। ১৮৩৫ সালে Harvey সাহেবের পরিচালনায় আরব্ধ জরীপকার্য প্রথম পর্যায়ে ১৮৪৮ সালে শেষ হয়। ('Chittagong District Gazetteer' (1908) L.S.S. O' Malley, P. 139)। জরীপের এই অন্তিম পর্যায়েই অর্থাৎ ১৮৪৭ সালে, দেশের মানুষের সর্বনাশের আশঙ্কা করে ডাঃ রামকিনু দত্ত সেই কার্যে বাধা দেবার চেষ্টা করেই কারাবরণ করেছিলেন। এই সময়ে আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল বলে ডাঃ রামকিনুর বর্তমান বংশধরদের মুখে শুনেছি। ঘটনাটি এই—রোগী দেখতে যাবার জন্যে ডাঃ রামকিনু অশ্বারোহণে গমনকালে কোনো উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী সেটাকে বেয়াদপি মনে করে তাঁকে আঘাত করলে রামকিনু সাহেবকে চাবুক মেরে ধরাশায়ী করে ছাড়েন। এই অপরাধে ডাঃ রামকিনুর এক বছর জেল হয় ঐ ১৮৪৭ সালে।[৪১]

রামকিনু দত্তের স্বাধীনচেতা ও দৃঢ় মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় আরেকটি ঘটনায়। প্রায় ৯১ বছর বয়সে বৃদ্ধ রামকিনু দত্ত নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগান অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে—"১৮৯১ সালে অমানুষিক বর্বরতার দ্বারা স্বাধীন ও শান্তিপ্রিয় মনিপুর রাজ্যকে ইংরেজরা গ্রাস করলে, ইংরেজদের তথাকথিত সভ্যতার মুখোশ খুলে তাদের জঘন্য রূপকে উদ্ঘাটন করতে ১৮৯২ সালেই ডা. রামকিনু *"Manipur Tragedy"* নামে একটি ক্ষুদ্র ইংরেজি কাব্য প্রকাশ করেছিলেন।[৪২] ব্রিটিশ শাসনামলে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে যেসব লেখক সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের দ্বারা ব্রিটিশ রাজের শোষণ-নিপীড়নের প্রতিবাদ করেন এবং পরিণামে নিজেরা নিগৃহীত হন তন্মধ্যে রামকিনু দত্ত উল্লেখযোগ্য। 'মনিপুর ট্র্যাজেডি'র জন্য তিনি নিগৃহীত হয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না। বইটি পাওয়া গেলে আরো বিস্তারিত জানা সম্ভব। 'Songs' গ্রন্থটির প্রায় আটাশ বছর পরে রামকিনু দত্তের কাব্যকর্মে কিরূপ বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছিল সে বিষয়েও অবহিত হওয়া যাবে।

রামকিনু দত্ত তিন পুত্র সন্তানের জনক ছিলেন, তাঁর কোনো কন্যা সন্তান ছিল না।[৪৩] এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ডাক্তার নবীনচন্দ্র দত্ত (১৮৫২-১৯২০) চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন এবং সম্ভবত বাঙালিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 'সিভিল সার্জন' হয়েছিলেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজসেবা ক্ষেত্রেও তাঁর বিচরণ ছিল। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপন কাল থেকে প্রথম দিকে তিনি এর সহ-সভাপতি ছিলেন এবং পরে সভাপতিও হয়েছিলেন।

রামকিনু দত্তের দ্বিতীয় পুত্র অনঙ্গচন্দ্র দত্ত (১৮৫৩-১৯১৪) হলেন কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তের পিতা। কর্মজীবনে তিনি সরকারের পি. ডব্লু. ডি বিভাগের চাকুরে ছিলেন। অনঙ্গচন্দ্র দত্তের মধ্যেও কাব্যপ্রীতি ও সঙ্গীতোৎসাহ ছিল। অল্প


www.pathagar.com

বয়সে 'ধ্রুপদের সাধনোপাখ্যান' নামে একটি আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে 'বনলতা' নামেও একটি কাব্য রচনা করেন। এছাড়াও তিনি দুটি বড় খণ্ডে আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন যাতে দত্ত বংশের বিস্তৃত ইতিহাস সংকলিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এটি কখনো মুদ্রিত হয়নি এবং এর পাণ্ডুলিপিও নষ্ট হয়ে গেছে।

রামকিনু দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র বিপিনচন্দ্র দত্ত (১৮৫৫-১৯৪৯)। কলকাতায় মেট্রোপলিটন কলেজে এফ. এ. পড়বার সময়ে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং কেশবচন্দ্রের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন। বিপিনচন্দ্র দত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্য কেশবচন্দ্র তাঁকে 'young bird of Chittagong' বলে ডাকতেন।

রামকিনু দত্তের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় তাঁর সকল সন্তানের মধ্যেই সাহিত্য, সঙ্গীত, সংস্কৃতিপ্রীতি ছিল সহজাত ; অনেকটা উত্তরাধিকারের মতনই। এমনকি রামকিনু দত্তের পৌত্র-পৌত্রীদের মধ্যেও সাহিত্য-সঙ্গীত প্রীতি লক্ষণীয়। অনঙ্গচন্দ্র দত্তের পুত্র জীবেন্দ্রকুমার দত্ত কবি, সাহিত্য সংগঠক ও সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে চট্টগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। অনঙ্গচন্দ্র দত্তের একমাত্র কন্যা হেমন্তবালার (জন্ম ১৮৮৯) দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল 'শিশির' (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) ও 'মাধবী' (১৩২২ বঙ্গাব্দ)।

রামকিনু দত্তের প্রথম সন্তান নবীনচন্দ্র দত্তের জন্মকাল (১৮৫২) থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি হয়ত অধিক বয়সে বিবাহ করেছিলেন। প্রথম সন্তানের জন্মকালে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৫১ বছর। অথবা রামকিনু দত্ত যথাসময়ে বিবাহ করে থাকলেও তাঁর স্ত্রী প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন বিবাহের যথেষ্টকাল পরে। এছাড়া 'Songs'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালেও তিনি সরকারি চাকরির নিয়মানুযায়ী চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার কথা। সে হিসেবে হয়ত প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদেও তাঁর পরিচিতিতে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদে শোভিত "Retired Medical Officer on Pension' কথাটা মুদ্রিত থাকা সম্ভব।

গ্রন্থটির নাম 'Songs with Native Tunes of Different Sorts and Dance' হলেও এটি আসলে কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ভূমিকাসহ ৪০। তবে সবশেষে একটি কবিতা আছে যেটির পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশ করা হয়নি। সেটিসহ পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর শিরোনাম নিম্নরূপ : Distich, On the Honour of Royal Marriage, Song, Comical, Pantomimic, Pantomimic Distich, Answer from the Husband in Mournful Accents, By the English Songsters, Distich on Arrival of 38th N.1., Mejnu to Leila, From Scientific Source, Leila Song, To H. J. S. Coton ও


www.pathagar.com

Chittagong Authorities. 'Distich' শিরোনামটি ব্যবহার করা হয়েছে দুটি বিভিন্ন কবিতার ক্ষেত্রে। শিরোনামযুক্ত এই ১৫টি কবিতা ছাড়াও গ্রন্থে বেশ কিছু জোড়া চরণ (Couplet), চতুষ্পদী (Quatrains) ও শিরোনামহীন কবিতা রয়েছে। গ্রন্থটিতে যথেষ্ট মুদ্রণ প্রমাদ লক্ষণীয়। যদিও গ্রন্থের শুরুতে একটি সংশোধনী (Errata) দেয়া হয়েছে তবুও এটি গ্রন্থের সমস্ত মুদ্রণপ্রমাদকে চিহ্নিত করতে পারেনি। মুদ্রণ প্রমাদের ফলে কখনো কখনো কোনো কোনো কবিতা শেষ না হওয়া সত্ত্বেও আচমকা কবিতার মাঝখানে সমাপ্তি চিহ্ন মুদ্রিত হয়েছে।

এবারে শিরোনামবিহীন সর্বশেষ কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। কবিতাটির নাম 'Chittagong Authorities'। রামকিনু দত্ত অনেকগুলো কবিতাতেই ব্যক্তিনাম ব্যবহার করেছেন। কখনো তাঁদের সদগুণের উল্লেখ করেছেন, কখনো তাঁদের অনুপ্রেরণার কথা। আর এই ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই ইংরেজ সিভিলিয়ন ; কোনো না কোনো সরকারি দপ্তরে কর্মরত। আলোচ্য কবিতাটিতে চট্টগ্রামের কমিশনার ডি. আর লায়াল, জর্জ এইচ গ্রিভেসোর, যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট ডি. আর ডগলাস, ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর এ. ম্যানসন, কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী সি. এ মিলস প্রমুখ ব্রিটিশ সিভিলিয়ানের চারিত্রিক গুণাবলির প্রশংসা করা হয়েছে। উক্ত কবিতার প্রথম চার পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

Mr. D. R. Lyall Mr.D.R. Lyall
Is the Commissioner of Chittagong so is well.
We congratulate upon with respect due,
His career as flashing as sun tipped hue.

উক্ত কবিতায় ডি. আর লায়ালসহ আরো যেসব ঐতিহাসিক ব্যক্তির নামোল্লেখ আছে তাদের জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে সি. ই বাকল্যান্ডের 'ডিকশনারি অব ইন্ডিয়ান বায়োগ্রাফি'তে ডি. আর লায়ালের সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২৫৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত জীবনী অংশটুকু থেকে জানা যায় যে, ডেভিড রবার্ট লায়াল ১৮৬১ সালে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এবং ১৮৮৭ সালে তিনি চট্টগ্রামের কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮৯১ সাল পর্যন্ত চার বছর ধরে তিনি উক্ত পদ অলংকৃত করেছিলেন। কাজেই আমরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারি যে রামকিনু দত্তের 'Chittagong Authorities' কবিতাটি তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (প্রকাশকাল আনুমানিক ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আরো একটি প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক যে 'Songs' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণকাল ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ। অন্যদিকে ডি. আর লায়াল চট্টগ্রামের কমিশনার হিসেবে কাজে যোগ দেন ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। কবিতাটির শুরু-ই হয়েছে লায়াল সাহেবের প্রশংসা দিয়ে। এই অসঙ্গতির কারণ কী ?


www.pathagar.com

এক্ষেত্রে আমাদের অনুমান হচ্ছে 'Songs' গ্রন্থটি মূলত ৪০ পৃষ্ঠাতেই সীমিত ছিল। ১৮৮৬ সালেই এটির মুদ্রণকার্য সম্পন্ন হয়। তারপরে হয়ত ১৮৮৬ সালের শেষ দিকে এটির বাঁধাই কাজ চলছিল। ১৮৮৭ সালে লায়াল সাহেব যখন কমিশনার হিসেবে কাজে যোগ দেন তখন রামকিনু দত্ত তাঁর প্রশস্তিতে এই কবিতাটি রচনা করেন এবং ছাপা হয়ে যাওয়া মূল গ্রন্থের সঙ্গে পৃষ্ঠাসংখ্যাবিহীন এই কবিতাটি জুড়ে দেন। আমাদের এই অনুমানের ভিত্তি আরো দৃঢ় হয় গ্রন্থটির আবয়বিক প্রকাশ দেখে। উক্ত কবিতাটি যে পৃথকভাবে মূল গ্রন্থের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে সেটা বোঝা যায়। আবার এমনও হতে পারে যে ১৮৮৬ সালে গ্রন্থটি বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বইয়ের সবগুলো কপির বাঁধাই কাজ হয়ত সম্পন্ন হয়নি। পরে অবাঁধাইকৃত গ্রন্থের সঙ্গে নতুন আরেকটি কবিতা জুড়ে দেয়া হয়েছে।

কবিতাটিতে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের যেভাবে প্রশংসা করা হয়েছে তা থেকে অনুমিত হওয়া স্বাভাবিক যে, কবি হয়ত তাঁদের খুশি করবার জন্যই উক্ত কবিতাটি রচনা করেছেন। 'Chittagong Authorities' কবিতায় ব্যবহৃত উপমা থেকে সেটা আরো স্পষ্ট হয়। যেমন : কমিশনার লায়াল সাহেবের চরিত্রকে অত্যন্ত নিষ্কলুষ, খাঁটি, পবিত্র বলা হয়েছে ; জর্জ গ্রিভেসোর সাহেবের বিচারকার্য, যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস সাহেবের কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্ব ইত্যাদির বর্ণনায় কবির উচ্ছ্বাস লক্ষণীয়। এতে একদিকে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয়ও হয়ত বিধৃত, তথাপি এতে অতিশয়োক্তির ছোঁয়া রয়েছে বলে ধারণা করা যায়। কবি রামকিনু উক্ত কবিতায় এবং আরো যেসব কবিতায় ইংরেজ সিভিলিয়ানদের উল্লেখ করেছেন তাঁদের তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন কিনা তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই—তবে সরকারি চাকুরে হিসেবে তিনি অনেকেরই কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

'Chittagong Authorities' কবিতার এক জায়গায় চট্টগ্রামের কমিশনার হিসেবে লায়াল সাহেবের নিযুক্তিতে কবি তাঁকে 'Fresh and new poems' রচনা করে সসম্মান অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের আলোচ্য কবিতাটি দ্বিতীয় সংস্করণেরই সংযোজনা। কিন্তু 'Fresh And new poems'-এর বহুবচনের ফলে যে সংশয় দেখা দিচ্ছে তা হল, গ্রন্থভুক্ত আর কোনো কবিতা রয়েছে কিনা যা প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত ছিল ? গ্রন্থের প্রথম সংস্করণটি পাওয়া না গেলে এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়।

এবারে গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করা যাক। 'Distich' কবিতাটি গ্রন্থের মুখবন্ধ কবিতা হিসেবে রচিত। এতে ঈশ্বরের মহিমার কথা আছে। পাপ ও অন্যায়ের পথ থেকে ঈশ্বর যাতে তাঁকে সত্য ও


www.pathagar.com

ন্যায়ের পথে নিয়ে যান সেই প্রত্যয় ব্যক্ত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজের কাব্য সম্পর্কে এক জায়গায় কবি বলেছেন,

I thank Thee for an idea that thou hast created in my heart.
On which through the faculty I met now a very fresh art.
Neither a single of the Asiatic poets had paid an attention to it.
Nor our benevolent Government ever have interested in it as yet.

এর পরে প্রাচীনকালে সাহিত্য-সঙ্গীত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতীয় রাজাদের অবদানের স্বীকার আছে। এই ধারা মুসলমান রাজাদের আমলেও অব্যাহত ছিল বলে কবি রামকিনু দত্ত মনে করেন।

কবির মতে, বর্তমানে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সারা পৃথিবী রাজত্ব করছেন রানী—নানারকম সংস্কারমূলক কার্যও চারিদিকে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু কবির দুঃখ কাব্যজগতের পুরনো সুরের বদলে যারা নতুন গান ধরেছেন তাঁদের কেউ প্রশংসা করছেন না। তবে কবি বলছেন—

Being myself desired by the Chittagong Magistrat Mr. J.D.Ward,
Got encouraged and commence writing a few songs in English word. (পৃ.৩)

এই কবিতা ছাড়া অন্যত্রও চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ার্ড সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর প্রশংসা আছে। কিন্তু, সি. ই বাকল্যান্ডের 'ডিকশনারি অব ইন্ডিয়ান বায়োগ্রাফি' বা অন্য কোনো সূত্রে জে. ডি ওয়ার্ড সম্পর্কে কোনো উল্লেখ না থাকাতে এই ঐতিহাসিক ব্যক্তির চট্টগ্রামের উপস্থিতির মেয়াদ বা তাঁর জীবনী সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

উদ্ধৃত কবিতাংশে কবি বলেছেন যে একটি নতুন ধরনের শিল্পচিন্তা তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছে। কোনো উপমহাদেশীয় কবি সে দিকে দৃষ্টি দেননি। এই অর্থে কবি হয়ত 'নেটিভ'দের ইংরেজি ভাষায় কাব্য চর্চার কথা বলেছেন। কিন্তু ইতোমধ্যে অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে যেটুকু আলোচনা করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, খুব বেশি সংখ্যক না হলেও রামকিনু দত্তের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের (১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) পূর্বে কাশীপ্রসাদ ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও হরচন্দ্র দত্তের কাব্যগ্রন্থ বেরিয়ে গিয়েছিল। তবে রামকিনু দত্তের এই কবিতার রচনাকাল যদি কাশীপ্রসাদ ঘোষের গ্রন্থ প্রকাশেরও (১৮৩০ এর আগে, তখন রামকিনুর বয়স ২৯ বছর) পূর্বে হয় তাহলে তাঁর যুক্তির ততটা প্রতিবাদ করা যায় না। এক্ষেত্রে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়। তবে কবিতায় বর্ণিত চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট


www.pathagar.com

ওয়ার্ড সাহেবের কার্যকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া গেলে এ বিষয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৮৬৩ সালের ১০ মার্চ ব্রিটেনের রাজকুমার 'প্রিন্স অব ওয়েলসের' সঙ্গে ডেনমার্কের রাজকুমারী আলেকজান্দ্রার বিবাহ উপলক্ষে প্রশস্তিমূলক কবিতা 'On the Honour of Royal Marriage'. কবি এই দিনটিকে ডেনমার্কের চন্দ্রের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সূর্যের মিলনের দিন বলে অভিহিত করেন। প্রসঙ্গক্রমে রানী, রাজপরিবারের সুখসমৃদ্ধি ও স্বর্গবাস কামনা করা হয়েছে কবিতায়। এছাড়া কবিতাটিতে শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি কবির বিশেষ ভক্তিভাব প্রকাশিত। নানারকম নৃত্য গীতবাদ্যে কবি রানীর প্রশংসায় রত। লক্ষণীয়, এই কবিতায় কবি নিছক আমোদজনক ও উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলো কবিতার মেজাজের সঙ্গে মিলে গেছে, যেমন : 'hurra', 'ding', 'dong', 'huzza' ইত্যাদি।

'Songs' একটি রোমান্টিক কবিতা। হেমন্তের পরে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ঘটেছে কিন্তু কবির প্রিয়তমার কোনো বার্তা এসে পৌঁছায়নি। প্রিয়তমার খোঁজে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নীলনদের তীর পর্যন্ত গেছেন কবি। কিন্তু তাঁকে আক্রমণ করে এক দুশ্চরিত্রা ডাইনি। কবি তাঁকে মিনতি করছেন লুকিয়ে রাখলে যেন তার প্রেয়সীকে সে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু ডাইনি লাঠি হাতে কবিকে তাড়িয়ে দেয়। কবি আর খুঁজে পাননি তাঁর প্রিয়তমাকে।

শীতের নিশ্চেতন রাত্রিতে উজ্জ্বল হলঘরে কুমারীদের মেলা, দরজায় পাহারা দিচ্ছে প্রহরী। 'Comical' কবিতার এই আনন্দ সভা সম্ভবত কবির দেখা বিদেশীদের কোনো আনন্দ উৎসবের অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। করিডোরে প্রচণ্ড ভিড়, বহুবর্ণিল পোশাকে সজ্জিত যেন নাট্য মঞ্চের রূপসীরা সব দ্রুত তালে নাচছে। বাজনা বাজছে নানা রকমের, নৃত্যগীত চলছে—চারিদিকে জেসমিন, টিউলিপ, নার্সিসাস প্রভৃতি ফুলের মেলা, সুগন্ধের ছড়াছড়ি—স্বামী-স্ত্রীরা জোড়ায় জোড়ায় নাচছে হাত ধরাধরি করে—হাতে হাততালি চলছে। কবি শেষ পর্যন্ত জানান যে, এটি এক বিবাহ উৎসবের কাহিনী।

'Pantomimic' কবিতাটি লোককাহিনীর আশ্রয়ে রচিত, সেটা কবিতার শিরোনাম থেকেই বোঝা যায়। এতে জীবন সম্পর্কে এক ধরনের দার্শনিক উচ্চারণ আছে। কবি জানাচ্ছেন যে, যে দিন চলে যায় সে দিন আর ফিরে আসে না। মায়ের কোলে থেকে, স্তন্য পান করে রাতদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার দিন কেটে গেছে। শিশুকালে একটি দিনের সাথে আরেকটি দিনের তফাৎ বুঝতে পারেননি তিনি, দ্রুত গতিতে পরিণত হয়েছেন সর্বভুক চতুষ্পদী প্রাণীতে। আত্মীয়-স্বজনের স্নেহের স্পর্শ ছিল সারাক্ষণ। কিশোর বয়সে তিনি হলেন অন্যের বিরক্তির কারণ। সারাক্ষণ মানুষের খুঁত ধরে ঠাট্টা ও বিদ্রুপে দিন কাটিয়ে দেন। তখন তিনি এক


www.pathagar.com

দ্বিপদী প্রাণী এবং দুষ্টও বটে। সঙ্গী সাথিদের কুমন্ত্রণা অনুসরণ করায় সদাতৎপর। বয়স একটু বাড়লে পিতামাতার সতর্ক দৃষ্টি নেমে এল তাঁর ওপর। স্কুলের শিক্ষাদীক্ষায় শুরু হল তার আরেক জীবন। যখন যৌবনকাল তখন একমাত্র চিন্তার কারণ দাঁড়াল জীবিকা। তখন কী করে দ্রুত লেখাপড়া শেষ করে টাকা উপার্জন করা যায় সেটাই একমাত্র চিন্তা।

এইভাবে কর্তব্যের দায় মেটাতে গিয়েই শহরের এদিকে ওদিকে ছোটাছুটির মধ্যে দিনরাত কেটে যায়। কবি তার দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু সমাজে তিনি কোনো মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান লাভ করতে পারেন না। জীবনের জটিল নাট্য অভিনীত হয়ে যায় কবির চোখের সামনে দিয়ে। একে একে পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেন—কবি একা হয়ে যান। তিনটি সন্তান নিয়ে তিনি শোকগ্রস্ততায় জীবন কাটাতে থাকেন। এক সময় তিনি একেবারে নিঃস্বতার দ্বারপ্রান্তে এসে ঠেকেন। এ অবস্থায় যদি ওয়ার্ড সাহেব (যাঁর কথা পূর্বেও এসেছে) অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাঁর অসীম করুণা হয়ত তাঁকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। এতে হয়ত বা তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটতে পারে।

উক্ত কবিতায় মানবজীবনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে কবি কাব্যিকতা ও দৃশ্যকল্পের অবতারণা করেন তা কবিতাটিতে রূপকতার ভাব সৃষ্টি করেছে। কবির নিজের বেদনাবোধ কবিতায় সর্বত্র ছায়াপাত ঘটিয়েছে। কবিতাটি মোট ১১টি স্তবকে রচিত—প্রতি স্তবকে ৫টি করে পঙক্তি। তবে প্রথম স্তবকটি দ্বিপদী।

'Pantomimic Distich' কবিতায় নৃত্যপর গৌরীর চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। টুপটাপ বৃষ্টির মধ্যে মনোরম পোশাকে সজ্জিতা সুন্দরী গৌরী নাচছে। কবিতার শেষে কবি জানাচ্ছেন যে এটি আসলে একটি হাস্যরসপূর্ণ ব্যালে। আকস্মিকভাবে কবিতাটিকে জনৈকা মাদাম র‍্যাচেলকে স্মরণ করা হয়েছে। সম্ভবত ইনি ছিলেন কোনো ব্রিটিশ সিভিলিয়ানের স্ত্রী।

'Distich' নামের দ্বিতীয় কবিতায় কবির কাছে যা যা শ্রেষ্ঠ মনে হয় তার একটি কাব্যিক তালিকা প্রদত্ত হয়েছে।

গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'Answer from the Husband in Mournful Accents'। কবিতার ভূমিকা হিসেবে বলা হয়েছে যে মুমূর্ষু স্ত্রীকে তার স্বামী ওষুধ খেতে পীড়াপীড়ি করছে। কিন্তু স্ত্রী তা না করে প্রত্যুত্তরে জানায় যে, তার জীবনের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। অতএব, এখন আর কোনো কিছুতেই কিছু হবার নয়। অতঃপর স্বামীটি স্ত্রীকে জানায় যে ভয়ের কোনো কারণ নেই, এ খুব সামান্য রোগ। স্বামীটি স্ত্রীকে তাদের বিগত জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাকে ছেড়ে যাতে সে চলে না যায় কাতরভাবে স্বামী সেই অনুরোধ জানায় তার স্ত্রীকে। এই কবিতাটি সম্ভবত কবি রামকিনু দত্তের পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতায় রচিত। এতে সাধারণ মানুষের অসহায়তা এবং কুসংস্কারের চিত্র প্রতিফলিত।


www.pathagar.com

'By the English Songsters' একটি সাদামাটা বিবৃতিমূলক কবিতা। 'Distich on Arrival of 38th N.I.' কবিতায় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন উপলক্ষে কবি নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যদের স্বাগতম জানাচ্ছেন এবং তাদের সমর পারঙ্গমতার প্রশংসা করছেন। এই কবিতায় বেশ কিছু ব্যক্তির নামোল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত এরা ঐতিহাসিক চরিত্র। ৩৮তম বাহিনীর ক্যাপ্টেন জন. এ ভ্যানরেনেন, লেফটেন্যান্ট জর্জ, ফার্গুস গ্রাহাম, হেনরি টোটেনহ্যাম, জন ফেনিসের বীরত্বের প্রশংসাসূত্রে কবিতায় বলা হয়েছে যে—সর্বত্র এঁরা বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করেছেন, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অসম সাহসিকতায় যুদ্ধ করে বিশ্বস্ত প্রজা ও ইয়োরোপীয় অভিবাসীদের রক্ষা করেছেন। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলা করে তাদের রাইফেল ও কামান দিয়ে জব্দ করেছেন। কবিতার উপসংহারে বলা হয়েছে—

We do not know whether or nor out Government,
Conferred them reminiscence while at campaign, (পৃ. ২৬)

উক্ত কবিতাটিকে একটি প্রামাণ্য কবিতা হিসেবে অভিহিত করা যায়। কবি এখানে যে বিদ্রোহ ও প্রতিপক্ষতার উল্লেখ করেছেন তা থেকে ধারণা করা চলে, তিনি হয়ত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কথা বলছেন যেখানে ক্যাপ্টেন ভ্যানরেনিন প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

Great credit is due to Captain Vanrenen,
Who took active part against republican. (পৃ. ২৬)

'Mejnu to Leila' কবিতায় ফারসি সাহিত্যের চরিত্রকে উপজীব্য করা হয়েছে। এতে মজনু লাইলীকে তার হৃদয়ের গভীর বেদনার কথা প্রকাশ করছে—

Oh Leila thou art cruel indeed thou art cruel indeed
Depriving me with heart, intellect castes, and creed
Thy imperfect love really drove me frantic,
Running hither and thither, thou take no heed.
Day passed, night passed, and passed the hours
Thou doest not inquire poor Mejnu expired or exiled.
(পৃ. ২৭)

মজনুর হৃদয়ের দুঃখকে কবি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পেরেছেন কাব্যে।

'From Scientific Source' একটি হাস্যরসাত্মক কবিতা যেখানে তিনজন রমণী তাদের ভাবী বর সম্পর্কে মন্তব্য করছে। এই কবিতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রমণীদের সংলাপকে কাব্যে প্রকাশ। কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক ভাবটা এখানেই যে, প্রত্যেকে তাদের হবু বরের নানান যোগ্যতা সম্পর্কে বলছে, যাদের প্রত্যেকেরই


www.pathagar.com

হয়ত একটি করে খারাপ দিক রয়েছে যা তাদের অন্য যোগ্যতাগুলোকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। যেমন প্রথম রমণীর সংলাপে—

I am going to be married a yankee gentleman
He is tall thin large framed with colic pain. (পৃ. ২৮)

'Leila Song' কবিতায় নশ্বর জীবনের কথা বলা হয়েছে। যদিও কবিতার শুরুতে বলা হয়েছে যে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে প্রিয় ঘরে এসেছে, অন্ধকার কেটে গেছে এবং চাঁদ জ্বলজ্বলে কিরণ ঢেলে চলেছে।

'To H. J. S. Cotton' একটি দীর্ঘ কবিতা যেটি জনৈক কটন সাহেবকে উৎসর্গ করা হয়েছে। কাব্যময়তা, বক্তব্য এবং শব্দ ব্যবহারের আলোকে এই কবিতাটি এই গ্রন্থের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কবিতা। এতে একদিকে চট্টগ্রামের কথা এসেছে, অন্যদিকে কবি রামকিনু দত্ত নিজের সম্পর্কে বলেছেন এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর বেদনাচ্ছন্ন দর্শন এখানে প্রকাশিত। সি. ই বাকল্যান্ডের 'ডিকশনারি অব ইন্ডিয়ান বায়োগ্রাফি' গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় স্যার হেনরি জন স্ট্যডম্যান কটনের (Sir Henry John Stedman Cotton) পরিচিতি—ইনিই সম্ভবত রামকিনু কথিত কটন সাহেব। এঁর জন্ম ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে। বাকল্যান্ডের গ্রন্থ প্রকাশকালে (১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ) ইনি জীবিত ছিলেন। ১৮৬৭ সালে তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি পদে কাজ করেন। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাংলার রাজস্ব বিভাগের গভর্নর হন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ৫৭ বছর বয়সে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের কে. সি. এস. আই উপাধি লাভ করেন। জন কটন 'New India, Or India in Transition' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

বাকল্যান্ডের গ্রন্থে উল্লিখিত কটন সাহেব এবং রামকিনু কথিত কটন একই ব্যক্তি হলে আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। কটন সাহেব বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। এর আগে তাঁর পক্ষে কোনোভাবেই চট্টগ্রামে সরকারি কোনো পদে আসীন থাকা সম্ভব নয়। ধরা যাক ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বা তার পরে তিনি চট্টগ্রামে আসেন চাকরি উপলক্ষে, তখন রামকিনু তাঁর যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে কবিতাটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। রামকিনু দত্তের 'Songs' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালের আগে (আমাদের অনুমান ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে)। কাজেই উক্ত কবিতাটি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে থাকা সম্ভবপর নয়—অর্থাৎ এটি দ্বিতীয় সংস্করণেরই সংযোজনা। কবি দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যে 'Fresh Poems'-এর উল্লেখ করেছেন তার সপক্ষে এই কবিতাটিকে 'Chittagong Authorities'-এর পরে আরেকটি কবিতা বলে ধরে নেয়া যায় যা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত ছিল।


www.pathagar.com

এবারে উক্ত কবিতায় প্রতিফলিত কবির আত্মপ্রক্ষেপ সম্পর্কে আসা যাক। কবিতাটি যে কবির বৃদ্ধ বয়সের রচনা তা সহজেই অনুমেয়। কবি বলছেন যে তাঁর জীবনের আনন্দের দিনগুলো পেরিয়ে গেছে। এখন পঙ্গুত্ব নিকটবর্তী। তিনি সকলের জন্য শোক করছেন। কিন্তু তার জন্য কেউ নেই। তিনি যেন গভীর সমুদ্রে ডুবে যাওয়া এক সওদাগরি জাহাজ—

Pleasures passed Away, perils are near,
My greatest grief now ceaims my tear ;
I am supposed alone in a very wide sea,
I grieve for the others, no one sighs for me,
My voice of morning may not be over,
I dare say, I am unnerved more over.
I am like a ship wrecked merchant in the deep
Along the waving surge swim and weep. (পৃ.৩৩)

বয়সের এই ভার সম্পর্কে আরো বলেছেন—তার শরীরের অংশগুলো রক্তশূন্য ও ঠাণ্ডা, তিনি এখন যেন একজন শিশু বা বয়স্কা বৃদ্ধা। শারীরিক এই জড়তার পাশাপাশি কবি তাঁর দারিদ্র্যের কথাও উত্থাপন করেছেন এবং কটন সাহেবের কাছে প্রার্থনা করছেন যেন মৃত্যুর পরেও তিনি কবিকে ভুলে না যান। কেননা, তিনি দূরে সরে গেলে আর কেউ নেই যাঁর কাছে কবি অভিযোগ পেশ করবেন। কবি তাঁকে ঝড়সংকুল আবহাওয়ায় নিরাপদ তীরের সঙ্গে তুলনা করে কবিতাটি শেষ করেছেন এভাবে—

When wheater is gusty and the fear greater,
All the vessels in the bay seek the shelter
So is Ramkinoo dutt forget him not,
He is victim of time now living in a hut. (পৃ.৩৫)

আলোচিত শিরোনামযুক্ত কবিতাগুলো ছাড়া শিরোনামহীন অনেকগুলো ক্ষুদ্র কবিতা, পংক্তি রয়েছে যেগুলো কবিতা হিসেবে বেশ সফল। সামগ্রিকভাবে বলা যায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রামকিনু দত্ত যে কবিতা রচনা করেছেন তাতে তাঁর উচ্চ ও পরিশীলিত মননের পরিচয় পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, ইংরেজি কবিতা রচনা করেও তিনি কোথাও মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেননি। উনিশ শতকের মধ্য ভাগে ইংরেজি মাধ্যমে সাহিত্যচর্চাকারী কবির জন্যে এটি এক গৌরবময় দৃষ্টান্ত।

কবি রামকিনু দত্ত ৯১ বছর বয়সে 'মনিপুর ট্র্যাজেডি' নামক যে ইংরেজি কাব্য রচনা করেন সেটি আবিষ্কৃত হলে হয়ত বা জানা যাবে ব্রিটিশ রাজের অন্যায়-পীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদের ভাষা ও ধরনটি। 'Songs' কাব্যগ্রন্থে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে সেটি জীবনের শেষ


www.pathagar.com

দিকে ঐ 'মনিপুর ট্রাজেডি'র রচনাকাল পর্যন্ত সমান ঔজ্জ্বল্যে বহাল ছিল না এর কোনো পরিবর্তন ঘটেছিল তাঁর বিশ্বাসে ও প্রকাশে সেটি সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া যাবে।

অ্যাংলো-বাঙালি কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, সরোজিনী নাইডু প্রমুখের চাইতে রামকিনু দত্ত হয়ত অধিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না এবং পূর্বোক্তদের কবিতার চাইতেও হয়ত বা তাঁর কবিতা অধিকতর শিল্পসফল হয়নি ; তথাপি অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় কবি রামকিনু দত্ত স্মরণযোগ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রথম অ্যাংলো-বাঙালি কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের চাইতে বয়সে ৮ বছরের বড়ো কবি রামকিনু দত্তের কাব্যজীবনের শুরু সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া গেলে অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটতে পারে। কেননা, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮২৭ সালে যখন স্কুলের ছাত্র হিসেবে ইংরেজিতে প্রথম পদ্য রচনা করেন তখন রামকিনু দত্ত ২৬ বছরের যুবক। যদি সেই সময়ের পূর্বেই তিনি ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করে থাকেন তাহলে প্রথম অ্যাংলো-ভারতীয় কবিতা রচনার কৃতিত্ব কাশীপ্রসাদ ঘোষ নয় রামকিনু দত্তের ওপরই বর্তাবে। এ বিষয়ে এখনো আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ করিনি যার দ্বারা এটি প্রমাণ করা সম্ভব।

## সূত্র নির্দেশ


১. *The Constitution of India,* Article 366 (2), Govt. of India press, 1974. উদ্ধৃত Evelyn Abel, *The Anglo Indian Community Survival in India,* Chanakya Publications, Delhi, 1988, P. 8

২. W. T. Roy, 'Hostages to Fortune', *Plural Societies,* Summer 1974, p. 56, VOL SB XIII. উদ্ধৃত. Evelyn Abel, পূর্বোক্ত, P. 9

৩. T.C. Hansard, *The Parliamentary Debates.* June 3, 1813. Vol. XXVI, London 1813, p. 562

৪. *Handbook of Bengal Missions,* in Connexion with the Church of England—Together with an Account of General Educational Effort in North India, London 1848

৫. রেভারেন্ড লং-এর উক্ত গ্রন্থের ৫ সংখ্যক পৃষ্ঠা





www.pathagar.com

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

৭. Charles Lushington, *The History, design and present state of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, Founded by the British in Calcutta and its vicinity*, Calcutta 1824, P. 7

৮. Willam Adam-এর রিপোর্ট, পৃ. ৫

৯. Charles Lushington, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

১০. উদ্ধৃত : Margarita Barns, *The Indian press*, London 1940, P. 176

১১. Sir Philip Hartog, *Some Aspects of Indian Education past and present*, Oxford University Press, London, 1939, P. 18

১২. রেভারেন্ড জেমস লং, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১৩. E. F. Oaten, *A Sketch of Anglo-Indian Literature*, London, 1908, p.16

১৪. শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য*, কলকাতা, ১৩৬১, পৃ. ২১৯

১৫. T. O. D. Dunn, *Bengali Writers of English verse. A Record and An Appreciation*, Calcutta, 1918, P. 5

১৬. প্রথম অ্যাংলো-বাঙালি তথা অ্যাংলো-ভারতীয় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের পরিচিতি সম্পর্কে C. E. Buckland তাঁর *'Dictionary of Indian Biography'* (London. 1906, p. 163) গ্রন্থে যা লিখেছেন : জন্ম ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাস ; ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে 'ফ্রি স্কলার' হিসেবে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন, ১৮২৮ সালে প্রফেসর এইচ, এইচ উইলসনের অনুরোধে 'গভর্নমেন্ট গেজেট' ও 'এশিয়াটিক জার্নাল'-এ প্রকাশের জন্য মিল-এর 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস' গ্রন্থের সমালোচনা লেখেন ; ১৮৩০ সালে ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের স্থানীয় রাজাদের ইতিহাস (পূর্বে যা ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের 'লিটারেরি গেজেট' পত্রিকায় ছদ্মনামে প্রকাশিত) ; ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে রিচার্ডসন নির্বাচিত ব্রিটিশ কবিদের কবিতার সংকলনে তাঁর রচনা অন্তর্ভুক্ত হয় ; ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে তিনি সাপ্তাহিক 'হিন্দু ইন্টেলিজেনসের' প্রকাশ শুরু করেন যেটি ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে ; ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ধর্মসভা'—তিনি সব ধরনের সামাজিক সংস্কারের বিরোধিতা করেন ; কলকাতা শহরের 'জাস্টিস অব দ্য পিস' এবং অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হন, ১৮৭৩ সালের ১১ নভেম্বরে মৃত্যুবরণ করেন।

১৭. T. O. D. Dunn, পূর্বোক্ত, P. 5

১৮. রেভারেন্ড জেমস লং, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬-৫১০


www.pathagar.com

১৯. নিজের সম্পর্কে কাশীপ্রসাদ ঘোষের এই মন্তব্যের রচনাকাল ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ এবং এটি প্রথম প্রকাশিত হয় রেভারেন্ড জেমস লং সম্পাদিত *ক্যালকাটা মানথলি ম্যাগাজিন* পত্রিকায়। পরে লং এটি গ্রন্থভুক্ত করেন। দ্রষ্টব্য : লং-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৫১০ পৃষ্ঠা

২০. T. O. D. Dunn, পূর্বোক্ত, P. ১৫

২১. *The Dutt Family Album*, London Longmans, Green And Co, 1870, PP. XII. 210

২২. ইংরেজি প্রতিবর্ণীকরণে মূল নামগুলো যথাক্রমে দাঁড়িয়েছে Govin Chunder, Omesh Chunder, Greece Chunder I Hur Chunder

২৩. T. O. D. Dunn, পূর্বোক্ত, P. 9

২৪. Latika Basu, *Indian Writers of English Verse*, University of Calcutta, 1933, PP. 26-27

২৫. *The Dutt Family Album* গ্রন্থের 'Preface'

২৬. T. O. D. Dunn, পূর্বোক্ত, P. 9

২৭. শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫

২৮. উক্ত গ্রন্থ তিনটি সম্পর্কে তথ্যের জন্যে T. O. D. Dunn-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

২৯. দ্রষ্টব্য : পৃ. ২৭-৩১

৩০. শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯

৩১. Latika Bass, পূর্বোক্ত, P. 83

৩২. Sarojine Naidu, *The Golden Threshold*, Introduction by Arthur Symons, London, William Heinemann, 1905, pp. 11-12

৩৩. Sarojine Naidu, পূর্বোক্ত, P. 13

৩৪. Latika Bass, পূর্বোক্ত, PP. 101-102

৩৫. প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *শশাঙ্কমোহন সেন ও জীবেন্দ্রকুমার দত্ত*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৭, পৃ. ৫৫

৩৬. মনীন্দ্রভূষণ দত্ত, 'রায় বাহাদুর নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর', *নব্য ভারত*, আষাঢ়, ১৩২৭

৩৭. প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৩৮. প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৩৯. ড. প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ, চট্টগ্রাম এবং কলকাতা*, মার্চ ১৯৯২, পৃ. ১২১

৪০. ড. প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২৪৮ পৃষ্ঠায় ২৯নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ড. প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি মারফত জানতে চেয়েছিলাম রামকিনু দত্তের এই বহুভাষা জ্ঞানের পরিচয় তিনি কোন সূত্রে পেয়েছেন এবং রামকিনু বিষয়ে আর কোনো তথ্য তিনি দিতে পারেন কিনা। ১১-৮-৯৩ তারিখে কলকাতা থেকে আমাকে লেখা চিঠিতে ড. প্রতাপ মুখোপাধ্যায় জানান যে 'রামকিনু দত্ত যে অনেকগুলো ভাষা জানতেন সেটি জীবেন দত্তের লেখাতেই পেয়েছি যতদূর মনে পড়ে কুমুদিনী মিত্র (বসু) সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' পত্রিকার ১৩১৮ সালের ভাদ্র


www.pathagar.com

থেকে কার্তিক এই তিনটি সংখ্যার কোনোটি থেকে। তাছাড়া আষাঢ় ১৩২৭ 'নব্যভারত' পত্রিকায় মনীন্দ্রভূষণ দত্তের লেখা রায় নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর 'প্রবন্ধটিও দেখতে পারেন।' বহু খোঁজ করেও ড. মুখোপাধ্যায়ের কথিত উৎসগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৪১. ড. প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭-২৪৮

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮। আমাকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতে ড. মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন : "২০/২৫ বছর পূর্বে চট্টগ্রামের দত্ত পরিবারের কোনো লোকের কাছে ওই ক্ষুদ্রকায়া Manipur Tragedy টি দেখেছিলাম সম্ভবত জীবেন্দ্র দত্তের জীবিতা (তখন পর্যন্ত) একমাত্র কন্যার কাছে। তখনও Xerox মেশিন কলকাতায় আসেনি, তাই Xerox করিয়ে রাখতে পারিনি। কলকাতার National Library তেও বই নেই—British Museum ev India Office Library তে অবশ্যই পাবেন।" কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতেও রামকিনু দত্তের দুটো বইয়ের একটিও পাওয়া যায়নি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে 'মনিপুর ট্র্যাজেডি' বইখানা নেই। বাংলাদেশ বা ভারতে কোথাও সম্ভবত রামকিনু দত্তের বই দুটি নেই। বিশিষ্ট গবেষক ও পণ্ডিত জনাব আবদুল হক চৌধুরী আমাকে প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ দুটি দিয়ে রামকিনু দত্তের জীবনী প্রসঙ্গে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনিই ড. মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানা দেন যাতে আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। জনাব আবদুল হক চৌধুরী আমাকে জানান যে, সম্ভবত আনোয়ারা গ্রামে কবি রামকিনু দত্তের কোনো বংশপুরুষ এখনো জীবিত থাকতে পারেন। আমরা ভবিষ্যতে আনোয়ারা গ্রামে গিয়ে আরো বিস্তারিত অনুসন্ধানের আশা রাখি।

৪৩. রামকিনু দত্তের সন্তান ও উত্তরসূরিদের সম্পর্কে জানার একমাত্র অবলম্বন প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'শশাঙ্কমোহন সেন ও জীবেন্দ্রকুমার দত্ত' গ্রন্থটি।


www.pathagar.com

# রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সাংবাদিকতা

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) ছিলেন একজন প্রথাবিরোধী বুদ্ধিজীবী। উনিশ শতকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কালপরিক্রমায় আয়ুষ্মান এই বহুমাত্রিক পুরুষ মূলত ইয়ং বেঙ্গল চেতনার সার্থক প্রতিনিধিরূপেই উত্তরকালে সমধিক পরিচিত। হেনরি ডিরোজিওর সফল উত্তরাধিকারবাহী কৃষ্ণমোহন আসলে উনিশ শতকের চেতনার চাইতেও অগ্রবর্তী ছিলেন। তাঁর নানাবিধ কর্মপ্রতিভা তাঁকে যুগন্ধর করেছে কিন্তু তাঁর সবগুলো পরিচয়ের সঠিক মূল্যায়ন সাধিত হয়নি।

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', বাকল্যান্ডের 'ডিকশনারি অব ইন্ডিয়ান বায়োগ্রাফি' এবং গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তর 'স্বদেশীয় ভারতবিদ্যা সাধক' গ্রন্থত্রয়ের সম্মিলনে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণমোহনের জন্ম কলকাতার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। নিদারুণ অভাবের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় তাঁর শৈশব-কৈশোর। তাঁর মা চরকায় সুতো কেটে, দড়ি পাকিয়ে সংসারের অভাব মেটানোর চেষ্টা করতেন। স্কুল-কলেজের ছাত্র থাকাকালে কৃষ্ণমোহন একবেলা ঘরের রান্নাবান্নার কাজ করতেন যাতে তাঁর মা ঐ সময়টুকুতে সুতো কেটে বা অন্য কোনো কাজ করে উপার্জনের অধ্যবসায়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন। কৃষ্ণমোহনের লেখাপড়া ডেভিড হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৪২) প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুলে। দরিদ্র হয়েও প্রভূত মেধার স্বাক্ষর রেখে স্কুলে-কলেজে বৃত্তি অর্জন করে শেষে ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত কলেজেই চাকরি পান তিনি। শিক্ষক হিসেবে কৃষ্ণমোহন যথেষ্ট খ্যাতি কুড়াতে সক্ষম হন। ১৮৫৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন। এ বিশ্ববিদ্যালয়েই সাহিত্য বিভাগের ডিনের দায়িত্ব পালন করেন, ১৮৬৭-৬৮-তে ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৮৭৬ সালে এখান থেকে ডক্টর অব ল' উপাধি পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সঙ্গে আর যে দুজন মনীষীকে একই খেতাবে ভূষিত করেন তাঁরা হলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং স্যার মনিয়র উইলিয়মস্। একই বছরে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সি. আই. ই উপাধি দেন।


www.pathagar.com

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা কেবল শিক্ষকতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজে শিক্ষাপ্রসারে, বিশেষ করে সে আমলেই নারীশিক্ষার বিস্তারে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানচিন্তার আবশ্যিকতার দিকটি প্রচার করেন তিনি। সেকালের জন্যে এটি ছিল এক অগ্রগণ্য দৃষ্টান্ত। ১৮৫১-তে প্রতিষ্ঠিত বেথুন সোসাইটির প্রথম সভাপতি ছিলেন কৃষ্ণমোহন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা বিষয়েই এক বিপুল গ্রন্থ সংরচন সম্ভব। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও স্বদেশী ধ্যান-ধারণাকে তিনি পরিত্যাগ করেননি। দেশের সাধারণ মানুষ যাতে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হতে পারে সে বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। নিজে বহুভাষাবিদ ছিলেন কিন্তু মাতৃভাষা বাংলার স্থান ছিল তাঁর কাছে সবার ওপরে। জ্ঞানের উচ্চতর শাখাসমূহে তাঁর বিচরণ এবং ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদনা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা জোরের সঙ্গে প্রচার করে গেছেন কৃষ্ণমোহন। বলা যায় মাতৃভাষায় শিক্ষা-অর্জনের সপক্ষে প্রচারণা তাঁর স্বদেশ চেতনার যথার্থ প্রমাণ।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন মাত্র ২০ বছর বয়সে (১৮৩৩ সালে)। বস্তুত মিশনারি এবং বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের একজন প্রধান ব্যক্তি আলেকজান্ডার ডাফের প্রভাব তাঁর ধর্মান্তরে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। ধর্মান্তরের দুই বছর আগেকার একটি ঘটনায় দেখা যাচ্ছে হেয়ার স্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণমোহন ইংরেজি পত্রিকা 'এনকোয়েরার' প্রকাশের জন্যে সরকারি অনুমতিপ্রার্থী। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী গঙ্গাজল স্পর্শ করে শপথ নিতে হত সত্যভাষণের দায়ের প্রতিশ্রুতিস্বরূপ। কিন্তু কৃষ্ণমোহন স্পষ্ট বলে দেন যে তিনি হিন্দুধর্ম মানেন না, তাই গঙ্গাজল স্পর্শে তাঁর আপত্তি। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে লেখা স্যার এডওয়ার্ড রায়ানের চিঠিতে (১৮৩১-এর ১৬ জুন) এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বোঝা যাচ্ছে কৃষ্ণমোহনের সনাতন ধর্ম ত্যাগের সিদ্ধান্ত আকস্মিক নয়—একটা প্রস্তুতিপর্বের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিলেন তিনি। ১৮৩১ সালে দেশীয় বিষয়নির্ভর ইংরেজি নাটক 'দ্য পারসিকিউটেড'-এ কৃষ্ণমোহন ইংরেজি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত দৃঢ়চেতা বাঙালি মানসের সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে উপজীব্য করেন। পণ্ডিত সুকুমার সেন এ নাটকের প্রশংসা করে বলেন, এটি ইংরেজিতে না হয়ে বাংলায় লেখা হলে বাংলা নাটকের বিকাশ অর্ধ শতাব্দী এগিয়ে আসত। নাটকটির প্রসঙ্গে একথা বলা যায় বাংলার সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় সামাজিক সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করবার ক্ষেত্রে কৃষ্ণমোহন যথেষ্ট ধীশক্তির পরিচয় দেন। নাটকটি প্রকাশিত হয় তাঁরই সম্পাদিত 'এনকোয়েরার' পত্রিকায়—নাটকটির একটি প্রধান গুণ এর ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সমাজদর্শনে সাংবাদিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বহু গুণে গুণান্বিত উনিশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। তাঁর অবস্থানকে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে


www.pathagar.com

তুলনা করেও মূল্যায়ন করা হয় সমকালীন পত্র-পত্রিকায়। ১৮৪৮ সালের ২০ জুন 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যাক—"এক্ষণকার বাঙালির মধ্যে রেবেরেন্ট শ্রীযুতকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নানা ভাষায় যেমন বিদ্বান এমন বিদ্বান্ এদেশে কখন হয় নাই, হইবে না, রামমোহন রায় বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বুঝিতে পারিতেন ইনি তাঁহাকে কাটিয়া যোড়াইতে পারিতেন।" বক্তব্যটিতে উচ্ছ্বাস আছে সত্য, কিন্তু সেসময়ে তিরিশোত্তর কৃষ্ণমোহনের এ মূল্যায়ন থেকে বোঝা যায় পরিপূর্ণ আয়ু ও কর্মযাপনকারী কৃষ্ণমোহনের গুরুত্ব কতখানি।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানস-জমি কর্ষণে ব্রিটিশ প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা, হিন্দু কলেজ, ডিরোজিও, ইয়ং বেঙ্গল দল প্রভৃতির ভূমিকা যথেষ্টই ছিল। তবু একথা অনস্বীকার্য তাঁর স্বকীয় দার্শনিক জিজ্ঞাসা এবং আত্মসচেতনতার বোধ ছিল তাঁর প্রধান চালিকাশক্তি। কর্মজীবনে নানা মাধ্যমে নিজের ধ্যান-ধারণাকে প্রকাশ করেছেন তিনি—তাঁর মৃত্যুর একশো বাইশ বছর পর এখনো তাঁর সাংবাদিক সত্তা সবকিছুকে ছাপিয়ে জোরালো হয়ে আছে। কৃষ্ণমোহনের শিক্ষাজীবন, সমাজ সংস্কারমানস এবং সাহিত্যিক সত্তার ত্রিবেণী তাঁর সাংবাদিকতাকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। উনিশ শতকের এক জটিল কালিক সংস্থানে বিবিধ প্রতিকূলতা ও বিভিন্নমুখী স্রোতের সামনে অবিচলভাবে কর্মের তরঙ্গে আগুয়ান হওয়ার যে দৃষ্টান্ত রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন রেখে গেছেন তার তুলনা মিলতে পারে অল্পসংখ্যকই।

তাঁর সাংবাদিকতার পথ দূরধিগম্য ছিল। হিন্দু কলেজের বাঁধভাঙা বিদ্রোহী ইয়ং বেঙ্গল-এর পটভূমি এরিমধ্যে সমাজে তাঁর ও তাঁদের সম্পর্কে একটা নেতিবাচক মনোভাব জাগিয়ে তোলে। ছাত্রজীবনের একটি ঘটনায় প্রতিবেশী ধার্মিক হিন্দুবাড়িতে গোমাংস-হাড় নিক্ষেপের ঘটনায় কৃষ্ণমোহন জড়িত না থাকলেও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কৃত্যের দায় তাঁকেও বইতে হয়। মাত্র ১৯ বছর বয়সে ব্রাহ্মণত্ব ছেড়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করায় দেশীয় সমাজের বিতৃষ্ণা ও ক্ষেত্রবিশেষে ঘৃণার ভাগীদার হন তিনি। যদিও আপন গুণাবলির মাহাত্ম্যে কালক্রমে সেই প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে যেতে তিনি সক্ষম হন। অন্যদিকে স্বাদেশিকতা ও স্বসংস্কৃতির প্রতি টানের কারণে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তিনি সমর্পিতপ্রাণ হননি। বরং মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচারের ব্রতে অধ্যবসায়ী হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ শাসিত দেশে এ প্রকার তৎপরতা নিঃসন্দেহে শাসকের অনুমোদনযোগ্য কর্ম নয়। যেসব বিষয় নিয়ে কৃষ্ণমোহন যৌবন থেকেই চিন্তাশীল সেসব বিষয় নিয়ে সমকালীন অন্যান্য ব্যক্তিও ছিলেন সজাগ—তবে ভিন্ন অর্থে। সমকালীন পরিমণ্ডলে একটা বৃহদংশ কৃষ্ণমোহনের কর্ম ও চিন্তার বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ হয়। কৃষ্ণমোহনের বিরুদ্ধে সমকালীন পত্র-পত্রিকা আক্রমণ


www.pathagar.com

চালায় কটাক্ষপূর্ণ ভাষায়। কৃষ্ণমোহন অবশ্য সেই সরোষ আক্রমণের মধ্যেও স্ব-আভিজাত্য বজায় রাখেন। গঠনমূলক রচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যাবলি সম্পর্কে নিজের চিন্তাধারাকে উপস্থাপন করেন তিনি।

ইয়ং বেঙ্গল সম্পর্কে সমকালে যতই নেতিবাচক মনোভাব থাকুক না কেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিক শেকড় সেখানেই প্রথম সন্ধান পায় জলের। বলতে গেলে তাঁর সাংবাদিকতার হাতেখড়িও এই পরিবৃত্তেই। হিন্দু কলেজের সমমনা যুবকদের সংগঠন অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের মুখপত্র 'পার্থিনন' ছিল বাঙালিদের দ্বারা প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি পত্রিকা। পত্রিকাটির মনোযোগের বিষয় স্ত্রীশিক্ষা, সনাতন ধর্ম, সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদি। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ বলেন যে ১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ সাল বাংলায় এক বিপ্লব তরঙ্গের কাল। রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই দুই দশকে স্রোতস্বর পরিক্রমা বহমান। 'পার্থিনন' পত্রিকার লেখক-পৃষ্ঠপোষক দলের নিয়মিত সভায় দার্শনিক, সামাজিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা হত। এঁদের প্রধান পৃষ্ঠাপোষক ছিলেন খ্যাতিমান ডিরোজিও। বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' গ্রন্থে এঁদের সম্পর্কে লেখেন যে এঁরা আসলে সমাজের বিভিন্ন গোঁড়ামি, কুসংস্কার, জড়তা, নিয়তিবাদ এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে পরবর্তীকালের সাংবাদিক কৃষ্ণমোহনের প্রত্যূষ 'পার্থিনন' যার আলোকছটা অচিরে ছড়িয়ে পড়ল নানা দিকে।

কলকাতার সদ্যোদ্ভূত যে নাগরিক সংস্কৃতিতে কৃষ্ণমোহনের পদচারণা তার রূপটি সহজ ও একরৈখিক ছিল না, বরং জটিল ও বহুরৈখিক ছিল। উনিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে কলকাতা শহরে নানা জাতি, বর্ণ, পেশা, ধর্মের মানুষের সমন্বয়ে এক বিচিত্র সংস্কৃতির অভিযাত্রা। বিদেশী শাসকের বিপুল কর্মোদ্যোগ চলমান—এর পরিণতি বা ফললাভের প্রহর তখনও সুদূরে। বহু ধারা ও বিচিত্র স্রোতের উপনিবেশ কলকাতায় সাংবাদিকতার পেশা তাই সহজ বস্তু ছিল না। ১৮৬৬ সালে ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত 'দ্য জার্নাল অব রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি'তে রেভারেন্ড জেমস লং-এর প্রবন্ধ 'ফাইভ হানড্রেড কোয়েশ্চেনস অন দ্য সোশ্যাল কনডিশন অব দ্য নেটিভস অব বেঙ্গল' অনুসরণ করলে দেখা যায় কলকাতা তখন আফগান, আর্মেনীয়, চীনা, ইস্ট ইন্ডিয়ান, গ্রিক, ফিরিঙ্গি, শিখ, জৈন, ইহুদি, মোঘল, মুসলমান, পার্সি, পর্তুগিজ ইত্যাদি নানা জাতের মানুষের সম্মিলনস্থল। রেভারেন্ড লং এই পরিপ্রেক্ষিতকে হিন্দুসমাজের জন্যে রূপান্তরের প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেন। কলকাতার মিশ্র নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারী কৃষ্ণমোহনের পক্ষে তাঁর স্বদেশী চেতনা ও বহিরাগত উপপ্লবের মধ্যে


www.pathagar.com

সমন্বয় সাধন ছিল রীতিমতো কঠিন পরীক্ষা। যে বিষয়গুলোকে তিনি তাঁর সাংবাদিকতার লেখনীতে তুলে আনেন সেগুলো সমকালীন প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিরুদ্ধবাদীরা সহজে ছাড় দিতে রাজি ছিল না। কৃষ্ণমোহনের সমকালে তাঁর তৎপরতাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব একদিক থেকে বাংলায় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসের আকর্ষণীয় উপাদান। মতভিন্নতার হেতু ভাষা-ব্যবহারে উপহাস-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ঘৃণাও যে প্রকাশযোগ্য হতে পারে সেটা এ পর্ব থেকে উপলব্ধি করা যায়।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক সূচনাকাল ১৮৩১ সালের ১৭ মে ইংরেজি এনকোয়েরার পত্রিকার প্রকাশের মাধ্যমে। পত্রিকাটির প্রধান অনুপ্রেরণাদাতা ছিলেন ডিরোজিও—ডিরোজিওর মৃত্যুও অবশ্য এবছরেই, ডিসেম্বরে। শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি—এই চতুরঙ্গ পত্রিকাটিতে মুখ্যতা পায়। কৃষ্ণমোহন নিজেও মনোযোগী ছিলেন এসব বিষয়ে, যদিও স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যের পরিবর্তে সমাজ সংস্কারমূলক বক্তব্যই প্রাধান্য পায় তাঁর রচনায়। এনকোয়েরার-ই তাঁর সাংবাদিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কেননা, কৃষ্ণমোহন সমকালীন আরো কয়েকটি পত্রিকায় বিভিন্ন সমস্যাশ্রিত প্রবন্ধ লিখলেও স্ব-সম্পাদিত পত্রিকাটিকে তিনি সাজাতে পেরেছিলেন নিজের মতো করে। আর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ থাকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এটি বিভিন্ন মহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এটি প্রকাশিত হওয়ার দিন দশেকের মধ্যে (২৮ মে ১৮৩১) সমকালীন আরেকটি পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী'র অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে—"গত ১৭ মে অবধি এনকোয়েরায়ের নাম ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় সংবাদপত্র এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত অল্পবয়স্কদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান সম্পাদক হন তৎপত্রের ভূমিকায় শেষভাগে অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে পত্রের প্রথমভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বক্তৃতা এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকদের বয়ঃক্রম চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের উর্ধ্বে নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাঁহাদের এতাবৎ অল্পবয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম।" 'সম্বাদ কৌমুদী' এটির প্রায় একদশক কাল পূর্বে প্রকাশ পায়। তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পরিচালিত হলেও এর মূল সঞ্চালক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজা রামমোহন পরিমণ্ডলের প্রশংসা অর্জন থেকে বোঝা যায় এনকোয়ারের সাংবাদিক অভিযাত্রা ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

'সম্বাদ কৌমুদী'র সপ্রশংস মূল্যায়ন থেকে কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করা যায় যা কৃষ্ণমোহনের সাংবাদিকতার চরিত্র নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আশৈশব মাতৃভাষা


www.pathagar.com

বাংলার অনুরাগী এবং বাংলা ভাষার প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণমোহনের ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের পশ্চাতে নির্দিষ্ট অন্বিষ্ট ছিল। পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল সমকালীন শিক্ষিত যুবমানস। পাশাপাশি সমাজে বিরাজমান সমস্যাগুলোতে আলোকপাত করার মাধ্যমে শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ। কৃষ্ণমোহন নিজে নানা বিষয়ে পণ্ডিত এবং পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক হয়েও যথেষ্ট সংযম প্রদর্শন করেন। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল একটি তরুণ অগ্রসৈনিক দল গড়ে তোলা যাদের কাজে উপকৃত হবে সংবাদপত্র জগৎ তথা দেশ-সমাজ। রক্ষণশীল পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' কিন্তু সেটা বেশ ভালোই বুঝতে পেরেছিল। 'প্রভাকর'-এর সম্পাদক ছিলেন একজন কবি—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কৃষ্ণমোহন স্বয়ং 'প্রভাকর'-এ লেখালেখি করতেন। তা সত্ত্বেও পত্রিকাটি কৃষ্ণমোহনের 'এনকোয়েরার' ও 'হিন্দু ইউথ' (১৮৩১-এর শেষ দিকে প্রকাশিত) পত্রিকা দুটিকে আক্রমণ করে কড়া ভাষায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি—"শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তি মহাশয়ের চট্টগেঁয়ে যে অপহারক মেং বাবু কৃষ্ণা ফ্রিঙ্গি [কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়] হিন্দু ইউথ নামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুষ্য পুত্র পত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাঁহার দক্ষিণহস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই বা এ পর্য্যন্ত কি করিলেন যে এইক্ষণে ঐ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্মের হানি করিবেক ভাল ২ বন্দা জেনো তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্তু আমারদিগের বোধ হইতেছে যে ঐ বাচ্ছা পত্র বন্দ্য বা পার অভিমতে সৃজন হয় নাই এ হায়াহীন ড্রজো [ডিরোজিও] ভায়ার কর্ম কেননা ড্রজো ভায়া ইস্টিন্ডিয়ান ও ইনকোয়েরর পত্রদ্বারা কিছু করিতে না পারিয়া এক নেংটে ইঁদুর বাহাদুরকে প্রেরণ করিয়াছেন যেমন মহীরাবণের ব্যাটা অহিরাবণ কিন্তু হে ফিরিঙ্গি সাহেব ড্রজো ভায়া তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া দর্গার থামে তাল ঠুকিয়া দলবল সঙ্গে করে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো কিন্তু কালামেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না।" 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সমালোচনার ভাষা থেকে স্পষ্ট যে এনকোয়েরার বা হিন্দু ইউথ-এর চেয়ে এগুলোর সম্পাদক কৃষ্ণমোহন এবং প্রেরণাদাতা ডিরোজিও-ই এর মূল লক্ষ্যবস্তু। 'প্রভাকর' কৃষ্ণমোহনের খ্রিষ্টত্বকে বেশ একচোট নেয় এবং 'এনকোয়েরার' পত্রিকাকে সনাতন ধর্মবিরোধী ভূমিকার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। সংবাদপত্রে মত প্রকাশের সুযোগে 'প্রভাকর' সেদিন এমন নগ্ন আক্রমণ চালায় যা ক্ষেত্রবিশেষে ভব্যতার সীমা অতিক্রম করে যায়। বলাবাহুল্য 'সংবাদ প্রভাকর' হিন্দু কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়েও কটাক্ষপূর্ণ রচনাদি প্রকাশ করে। মনে রাখা দরকার ১৭৯৯ সালের ১৩ মে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সংবাদপত্র বিধির বরাত দিয়ে যে নিয়মকানুন প্রণীত হয় (যা ওয়েলেসলির রেগুলেশন নামে পরিচিত) তাতে কোনোপ্রকার ব্যক্তিগত আক্রমণকে নিষিদ্ধ করা


www.pathagar.com

হয়। বস্তুত 'এনকোয়েরার'-এর সমাজসংশ্লিষ্ট ঋজু বক্তব্য এবং পত্রিকাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিন্দু কলেজ পরিবৃত্তের মানুষজনদের সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি ইংরেজি শিক্ষা এবং নারীশিক্ষা বিরোধী 'সংবাদ প্রভাকর'- মণ্ডলী।

এনকোয়েরার ও হিন্দু ইউথ পত্রিকাদ্বয়ের মাধ্যমে সাংবাদিকতার জগতে সমাজ সচেতনতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, পূর্ববর্তী রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের পত্রিকা হলেও তাতেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটে, কৃষ্ণমোহনের জন্যে সেটাও একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ছিল। ১৮৫০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর 'সংবাদ সুধাংশু' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষাশ্রিত সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ। একনাগাড়ে চার বছর প্রকাশের পর ১৮৩৫-এ বন্ধ হয়ে যায় 'এনকোয়েরার'। 'এনকোয়েরার' বন্ধ হওয়া থেকে 'সংবাদ সুধাংশু'র প্রকাশনা—এই দেড়যুগ কৃষ্ণমোহনের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কর্মজীবনে তিনি তখন খ্রিষ্টধর্মের প্রচারণা এবং বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বে নিয়োজিত। ১৮৩৭-এ বিশপস কলেজ সংলগ্ন গির্জায় যাজকত্বের কাজ শুরু করেন তিনি। ১৮৩৮-এ হিন্দু কলেজের পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে 'সোসাইটি ফর দ্য একুজিশন অব জেনারেল নলেজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। উক্ত সোসাইটির কর্মোদ্যোগের মধ্যে ছিল জ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে পাঠচক্র এবং সেমিনার। ১৮৩৯-এ একটি নবনির্মিত চার্চ-এর আচার্য পদে অভিষিক্ত হন কৃষ্ণমোহন। ১৮৪০-এ 'এ প্রাইজ এসে অন ফিমেল এডুকেশন' রচনার জন্যে তিনি পুরস্কৃত হন। পরের বছর শিক্ষাবিদ ডেভিড হেয়ার স্মৃতি কমিটির কাজে তাঁর ব্যস্ততা বেড়ে যায় এবং ঐবছর প্রকাশিত হয় তাঁর অনূদিত বাইবেল। বস্তুত ধর্মপ্রচারণা এবং সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থেকেও শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ প্রভৃতি বিষয়েও তিনি সমান মনোযোগী ছিলেন। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষিত কৃষ্ণমোহনের বাংলায় বাইবেল অনুবাদ তাঁর মাতৃভাষায় দক্ষতারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একই সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি এবং ধর্মবিষয়ক বিতর্কে অংশগ্রহণ ও প্রবন্ধ রচনাও চলতে থাকে সমান্তরালে। ১৮৪২ সালে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' নামক দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ পেলে কৃষ্ণমোহন এটির একজন নিয়মিত লেখক নির্বাচিত হন। এর বাইরেও 'ক্যালকাটা রিভ্যু', 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন', 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর রচনায় সমৃদ্ধ হয়।

১৮৪৬ সাল রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সময়। 'সংবাদ সুধাংশু' প্রকাশের আগে যে বিপুল কর্মোদ্যোগে তিনি সমাজের শ্রীবৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেন তারই একটি মাইলফলক 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামক ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত কোষগ্রন্থ। সর্বমোট ছয় বছরে এগুলো প্রকাশ পায়। এটি একটি


www.pathagar.com

দ্বিভাষিক কোষগ্রন্থ যার ইংরেজি নাম 'এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস'। 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন' (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণমোহনের এই কোষগ্রন্থে "সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে সুলিখিত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। এতে সন্নিবিষ্ট অনূদিত নিবন্ধাবলির মধ্য দিয়ে বাঙালি পাঠক পাশ্চাত্যের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে তথ্য ও জ্ঞানলাভ করেন।" প্রথমে বাইবেল অনুবাদ, তারও আগে গির্জায় প্রার্থনানির্ভর 'উপদেশকথা' পুস্তিকা এবং 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'-এ দুই ভাষার তুলনামূলক চর্চা কৃষ্ণমোহনের গদ্যরীতির বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। এখানে স্মরণযোগ্য কৃষ্ণমোহনই একদিন (১৮৩৪-৩৫ এর দিকে) শিক্ষার বাহন বিষয়ের ওপর একটি বিতর্কসভায় একজন ইংরেজের সঙ্গে প্রচণ্ড বাদানুবাদে জড়িয়ে শেষে স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য রাখেন, "বাংলা একদিন শিক্ষার বাহন হবে"। কাজেই কৃষ্ণমোহনের বাংলা ভাষাচর্চা শুধু যে কাজের প্রয়োজনে তাই নয় এর সঙ্গে তাঁর মনের গভীরে নিহিত একটা স্বাদেশিকতার বোধও ছিল। 'সংবাদ সুধাংশু'র প্রকাশ তাঁর সেই বাংলা ভাষাপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ। বাংলা ভাষার ওপর তাঁর দখলের প্রমাণ তাঁর রচিত এ সময়কার ধর্মবিষয়ক রচনাগুলো। কৃষ্ণমোহনের গদ্যের নমুনা অনুসরণ করা যাক—"যাহাদের শুনিবার কর্ণ ছিল অর্থাৎ যাহাদের শ্রবণ করিবার মানস ছিল, তাহাদিগকে তিনি কহিলেন সাবধান হও, কি প্রকারে শুন, কেননা তোমাদের মনোযোগানুসারে এবং যাহা শ্রবণ কর তাহাতে উপকৃত হইবার ইচ্ছার পরিমাণে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রসাদ ও জ্ঞান পাইবা।" (টমাস উইলসন রচিত 'সারমন' গ্রন্থের অনুবাদ, ১৮৪৪) গদ্যশিল্পী কৃষ্ণমোহনের অবদান প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস সঙ্গতভাবেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস'-এ বলেন, "কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ভবানীচরণ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি বিরাট অথচ অধুনা-বিস্মৃত সাহিত্য-সেবকদের কীর্তি আজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুধ্যান না করিলে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কীর্তির সম্যক পরিচয় লাভ করা কখনই সম্ভব নয়।"

সামাজিক অভিজ্ঞতা, স্বাদেশিকতার বোধ এবং বাংলা গদ্যে সাবলীল প্রকাশ এই ত্রিমাত্রিকতার ধারক কৃষ্ণমোহনের 'সংবাদ সুধাংশু'র প্রকাশ তাঁর সাংবাদিক জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এনকোয়েরার, হিন্দু ইউথ পত্রিকাদ্বয়ের অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট কাজে লাগান তিনি। 'সংবাদ সুধাংশু'তে বিভিন্ন বিষয়ের স্থান হয় এবং মুক্তদৃষ্টি ছিল এটির মুখ্য অবলম্বন। হিন্দু কলেজের কৃতি ছাত্র এবং কৃষ্ণমোহনের সুহৃদদের সহযোগিতা তাঁর সাপ্তাহিকীটির অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। যেসব বিষয় পূর্ববর্তী ইংরেজি পত্রিকা দুটিতে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সেগুলো 'সংবাদ সুধাংশু'তেও স্থান পায়। পূর্ববর্তী যৌবনোচিত উদ্যত


www.pathagar.com

স্বভাবের অনেকটাই অভিজ্ঞ কৃষ্ণমোহন পরিহার করেন এ বেলা এবং সাধারণ মানুষের শিক্ষা প্রসঙ্গ, স্বদেশের সমস্যাবলি, স্ত্রীশিক্ষার নানা দিক এবং বিজ্ঞানচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা প্রভৃতি বিষয়ে যুগোপযোগী বক্তব্যই এতে উপস্থাপন করা হয়। 'সংবাদ সুধাংশু'র সমকালে বাংলা অঞ্চলে এবং কলকাতায় শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটতে থাকে সরকারি উদ্যোগে। সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে শিক্ষিত জনের। নানা বিষয়ে উৎসাহী যুবকদের শ্রেণী তৈরি হয়। এফ ডব্লুউ থমাস-এর 'দ্য হিস্ট্রি এ্যান্ড প্রসপেক্টস অব ব্রিটিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া' (১৮৯০) গ্রন্থ থেকে জানা যায় উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষা এবং সার্বিকভাবে স্কুল-কলেজ কেন্দ্রিক শিক্ষার অগ্রগতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৮৫২ সালে চার্লস ক্যামরুন পার্লামেন্টে দেশীয় শিক্ষার প্রসার ও বিকাশকল্পে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বলা যায়, সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়া এ সময় একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল। ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও এটি উপলব্ধি করে যে ভারতে ইয়োরোপীয় জ্ঞানের বিকাশ ঘটালে দেশীয়রা উপকৃত হবে। (রপার লেথব্রিজ, হাই এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া : এ প্লি ফর দ্য স্টেট কলেজেস, ১৮৮২) পেশায় শিক্ষক হওয়ার কারণে বাংলার শিক্ষা প্রসঙ্গ সাংবাদিক কৃষ্ণমোহনের মানসে স্থির ছিল বরাবর। শিক্ষায়তনের অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগান তাঁর সাংবাদিকতার মধ্যে। ফলে 'সংবাদ সুধাংশু' একদিক থেকে বিকাশমান তরুণ-মানসের লক্ষ্যকে সামনে রাখে। সামাজিক প্রসঙ্গাদির সহজ সাবলীল উপস্থাপনার মাধ্যমে তারুণ্যকে উদ্বেজিত করা কৃষ্ণমোহন সম্পাদিত পত্রিকাটির একটি বিশেষ দিক হয়ে দাঁড়ায়। পত্রিকাটি বছরখানেক চালু থেকে বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র এক বছরের আয়ু পেলেও এটি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিকতা ও সমাজহিতৈষণার স্বপ্নকে অনেকখানি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়।

সাংবাদিক রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বহুমাত্রিক। তাঁর সামাজিক সত্তার নানা আভিমুখ্যর কারণে সাংবাদিকতায় পরিপূর্ণ মনোযোগ দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, তথাপি সংবাদপত্রের সেই ঊষাকালে সাংবাদিকতার ব্রতকে তিনি সত্যিকার অর্থে মানব সেবার লক্ষ্যেই চালিত করেছিলেন। নিরন্তর চেষ্টায় নিজেকে তিনি বাংলা গদ্যের আবশ্যিক কারিগরে পরিণত করেন। বলা যায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের সামাজিকতা তাঁর গদ্যে সমাজসংলগ্নতার গুণ যোগ করে যা তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মেই বহাল থেকেছে। এনকোয়েরার-এর ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন 'ট্রুথ এ্যান্ড হ্যাপিনেস'-এর অন্বিষ্টে অভিযাত্রার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সাংবাদিকতা থেকে অবসর নেবার পরও তাঁর সেই অভিযাত্রায় যতিপাত ঘটেনি।

খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং ধর্মবিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রেখেও কৃষ্ণমোহন নিজেকে অধ্যাত্মবাদে সমর্পণ করেননি, বরং বারংবার যোগ দিয়েছেন


www.pathagar.com

জীবনের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে। তাঁর সাংবাদিক সত্তার অনুপ্রেরণাই এক্ষেত্রে তাঁকে শক্তি যুগিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণমোহন কোনো বিশেষ সম্প্রদায় কিংবা ধর্মের বৃত্তে আটকে না থেকে বৃহত্তর পরিবৃত্তে পৌছান। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিখ্যাত 'রামতনু লাহিড়ী' গ্রন্থে তাই লেখেন, "১৮৮০ সালে কলিকাতার অধিবাসীগণ তাঁহাকে মিউনিসিপালিটীতে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে বরণ করেন। মিউনিসিপালিটীতে সকলে তাঁহাকে নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ ও অধর্ম্ম-বিদ্বেষী লোক বলিয়া জানিত। তিনি স্বকর্ত্তব্য-সাধনে কখনই অপরের মুখাপেক্ষা করিতেন না। এইরূপে চিরদিন তিনি স্বদেশে বিদেশের লোকের আদর সম্ভ্রম পাইয়া সকলের সম্মানিত হইয়া কাল কাটাইয়া গিয়াছেন।"

১৮৭৬ সালে প্রায় শেষ বয়সেও কৃষ্ণমোহনের মধ্যে দার্ঢ্যের অভাব ঘটেনি। কলকাতার টাউন হলে ব্রিটিশ সরকারের 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্টের' প্রতিবাদে যে জনসভা হয় তার মূল সঞ্চালক ছিলেন কৃষ্ণমোহন। সরকারের সিদ্ধান্তবিরোধী সভায় তাঁর গ্রেফতার কিংবা অভিযুক্তির ঝুঁকি সত্ত্বেও তিনি পিছপা হননি এবং সরকারের প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখেন। ১৮৭৮-এ যখন জনগণের সচেতন প্রতিবাদের ফলে উক্ত আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত হয় তখন দেশী বিদেশী অনেকেই কৃষ্ণমোহনকে অভিনন্দন জানান তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বশালী ভূমিকার জন্যে।

১৮৮৫-তে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির সম্মানে যে কটি শোকসভা ও নাগরিকসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে দেশী বিদেশী সকলের কণ্ঠেই অপরিমেয় শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়। কলকাতার বিশপের 'বেঙ্গল খ্রিস্টান কনফারেন্সে' প্রদত্ত বক্তৃতা (১৮৮৫-র ৯ জুন) থেকে জানা যায়, ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার বোডেন অধ্যাপক পদটি শূন্য হলে সেখান থেকে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত কৃষ্ণমোহনকে অক্সফোর্ডে উক্ত পদে যোগ দেবার জন্যে বলা হলে কৃষ্ণমোহন সসম্মানে তাতে অপারগতা প্রকাশ করেন। সমস্যাপীড়িত কিন্তু বিকাশমান স্বদেশের কর্মের স্রোত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে রাজি ছিলেন না কৃষ্ণমোহন।


www.pathagar.com

# প্রথম বাংলা শিক্ষা-পত্রিকা

প্রথম বাংলা শিক্ষা-পত্রিকা 'ছাত্রমিত্র' ১৮৯২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার সিএমএস স্কুল বা চার্চ মিশনারি সোসাইটি স্কুল থেকে প্রকাশিত হয়। মাসিক এ পত্রিকাটির সর্বমোট আটটি সংখ্যা প্রকাশের সংবাদ পাওয়া যায়। ক্রমান্বয়ে ৮ মাস (১৮৯৩-এর এপ্রিল পর্যন্ত) চালু থাকার পর এটি সম্ভবত আর প্রকাশিত হয়নি। ডিমাই এক-অষ্টমাংশ আকৃতিতে সাদা কাগজে ছাপা পত্রিকাটি বর্তমানে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। এটির ক্যাটালগ নম্বর-কিউ ৮৩৪. সি.১১.৫। পত্রিকাটির সম্পাদক এফ বি গুইন বা ফ্র্যাংক বি গুইন জন্মসূত্রে ব্রিটিশ। শিক্ষকতার পেশায় যোগদানের জন্যে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। উক্ত পত্রিকার একটি সংখ্যায় (চতুর্থ সংখ্যা) সমুদ্রপথে তাঁর ভারতাগমনের বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল। সম্ভবত তিনি চার্চ মিশনারি সোসাইটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপেই কাজ শুরু করেন। আমাদের অনুমানের কারণ প্রতিষ্ঠান প্রধান হওয়ার অধিকারেই হয়ত তাঁর পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব প্রাপ্তি। 'ছাত্রমিত্র' যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত কেবল ছাত্রদের কল্যাণেই প্রকাশিত বাংলা ভাষার প্রথম শিক্ষা-পত্রিকা তা পত্রিকা সম্পাদক গুইন-এর বক্তব্য থেকে জানা যায়। তিনি জানাচ্ছেন—

> "প্রিয় বালকগণ !
>
> এই নূতন পত্রিকাখানি দর্শনে তোমরা "আর একখানি পত্রিকা ! আর একখানি নূতন পত্রিকা !" বলিয়া আশ্চর্য্য হইতে পার ; কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে বঙ্গদেশে যে সকল পত্রিকা আছে এখানি সেগুলির মত নয়। এ একখানি নূতন প্রকারের পত্রিকা। এখানি কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের উপকারার্থে প্রকাশিত, এবং বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দের যেসকল বিষয় জানা আবশ্যক, ইহাতে কেবল সেই সকল বিষয়েরই সমালোচনা করা যাইবে।" (প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৮৯২)

বস্তুত ১৮১৮-তে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' থেকে শুরু করে ১৮৯২-এর 'ছাত্রমিত্রে'র প্রকাশনা পর্যন্ত পত্রিকার সংখ্যা কম নয়; কিন্তু গুইন সম্পাদিত


www.pathagar.com

'ছাত্রমিত্র' সম্পাদকের দাবি অনুযায়ী এবং ইতিহাসসম্মতভাবেই কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানাশ্রিত প্রথম বাংলা শিক্ষা-পত্রিকা। 'ছাত্রমিত্র'র চার বছর পূর্বে ১৮৮৮ সনে যশোর থেকে 'শিক্ষা' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রিয়নাথ বসুর সম্পাদনায়। নাম 'শিক্ষা' হলেও এটি ছিল 'বনগ্রাম ছাত্র সমিতির' মুখপত্র। শিক্ষা পত্রিকার যে চরিত্র অর্থাৎ যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার অবস্থা, শিক্ষা সম্পর্কিত নানা দিক প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ, পত্রিকাটিতে লক্ষ করা যায় না। এটি সমিতির মুখপত্ররূপেই মূলত আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৯ সনে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'শিক্ষা পরিচয়'ও ছিল একটি সমিতির মুখপত্র। এর সম্পাদক ছিলেন শরচ্চন্দ্র চৌধুরী। শিক্ষার পরিচর্যা এবং জাতীয় সাহিত্য বিস্তার ইত্যাদি মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও এটিও শিক্ষা-পত্রিকার চরিত্র অর্জন করতে পারে না। 'ছাত্রমিত্র'র পরে ১৮৯৩ সালে রংপুর থেকে 'ছাত্রসহচর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় মূলত নিম্ন প্রাইমারি ছাত্রদের জন্যে। এছাড়া ১৮৯৫ সনে খুলনা থেকে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাচরণের সম্পাদনায় 'শিক্ষাদর্পণ' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

'ছাত্রমিত্র' প্রথম বাংলা শিক্ষা-পত্রিকা এবং এ ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে এটি ঐতিহাসিক নীরবতার শিকার। সুকুমার সেন, সজনীকান্ত দাশ, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, মুনতাসীর মামুন—সাহিত্য কিংবা ইতিহাসের উপর্যুক্ত গবেষকদের কোনো গ্রন্থেই 'ছাত্রমিত্র' সম্পর্কিত তথ্য বা রচনা স্থান পায়নি। তাহলে কি ধরে নেয়া যায় তাঁরা পত্রিকাটির অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত নন বা ছিলেন না। নাকি মিশনারি এবং ইংরেজি ভাষার প্রাধান্যনির্ভর প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলা শিক্ষা-পত্রিকা প্রকাশের বিষয়টি তাঁদের মনোযোগে স্থান পায়নি। ঐতিহাসিক-গবেষকগণ যদি পত্রিকাটি দেখেও থাকেন অন্তত ঐতিহাসিকতার বিচারে হলেও পত্রিকাটি উল্লেখের দাবিদার।

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্বপূর্ণ কালবৃত্ত উনিশ শতকের সমাপনী দশকে প্রকাশিত হয় 'ছাত্রমিত্র'। এই শতকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংঘটিত নানা কর্মকাণ্ডে শিক্ষাকেন্দ্রিক তৎপরতা একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচনকারীরূপে প্রতীয়মান হয়। ১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা, ১৮১৮ সালে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, ১৮৩১-এ ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত প্রথম শিক্ষাশুমারি এবং ১৮৩৫-এ বিলাতের কমন্স সভায় বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার সম্পর্কিত উদ্যোগ-আয়োজন উনিশ শতকের প্রথম চার দশকের ব্রিটিশ শাসকদের একটি সুপরিকল্পিত কর্মযজ্ঞের পর্যায়-পরম্পরা। ১৮৫৪ সালে প্রণীত হয় ব্রিটিশ সরকারের প্রথম শিক্ষাভাষ্য। এদিকে নানামুখী বিকাশ ঘটতে থাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের। প্রতিষ্ঠিত হয় মিশনারি ও অমিশনারি বা সরকারি স্কুল-কলেজ। আবার সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল ও কলেজের সংখ্যাও


www.pathagar.com

বাড়তে থাকে। স্থাপিত হয় নারীদের নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শতাব্দী শেষে তা যথার্থই নারীদের প্রচলিত অবস্থানের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচকে দাঁড়িয়ে যায়। ১৮৮২-তে প্রণীত দ্বিতীয় শিক্ষাভাষ্যের সময়ে দেখা যাচ্ছে ভারতে এবং বিশেষত বাংলায় ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী একটি স্পষ্ট ধারার রচয়িতা। বলা যায় শিক্ষা বিষয়টি ১৭৯৩-এ ভূমিসংস্কারের পর ব্রিটিশদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারি-অমিশনারি দ্বন্দ্বের বাস্তবতা সত্ত্বেও ইংরেজি শিক্ষা দেশীয় মানসে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ দিকনির্দেশকরূপে আবির্ভূত হয়। ক্রমেই ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী একটি শক্তিশালী কেন্দ্রগ রূপে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবর্তনে প্রভাবসম্পাতী ভূমিকা রাখে। 'ছাত্রমিত্র' পত্রিকাটির প্রকাশকাল (১৮৯২) কাজেই পুরো শতাব্দীর শিক্ষা চরিত্রের প্রেক্ষাপটেই গুরুত্ববহ। তাছাড়া পত্রিকাটির চরিত্র বিশ্লেষণে বাংলায় ঔপনিবেশিক কালের শিক্ষা অবস্থার নানা দিকও পরিস্ফুট হতে পারে। (এ প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের আরেকটি প্রবন্ধ 'বাংলায় ঔপনিবেশিক শিক্ষা' পাঠযোগ্য।)

'ছাত্রমিত্র'র প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচি থেকে বোঝা যায় পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য 'বঙ্গীয় ছাত্র'গণ। বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশে অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সামনে একটি জ্ঞানরাজ্যের সূত্র ধরিয়ে দেবার চেষ্টা এতে প্রধান। তবে বিষয়সমূহের বিবরণে মন্তব্যে-মূল্যায়নে এবং কখনো কখনো অনুসিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পত্রিকার সম্পাদক বা লেখকদের মনোভাবেরও প্রতিফলন থাকে। এতে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ও যোগসূত্র স্পষ্ট হয়। সম্ভবত পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক বা লেখকদের আকাঙ্ক্ষাও ছিল তা-ই। প্রথমেই বিষয়গুলোর শিরোনাম লক্ষ করা যাক : (১) সম্পাদকের পত্র (২) কী করা উচিত বা করিতে হইবে (৩) ইংরেজ-সমাজে মিশিতে গেলে কিরূপে চলা উচিত (৪) সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা (৫) দিব্য করা অনুচিত (৬) খোয়া আলপিন (৭) পাঁচ ফুলে সাজি (৮) প্রহেলিকা (৯) "দুটি ফুল" (১০) আপন জিহ্বাকে দমন কর (১১) সংবাদ।

'সম্পাদকের পত্র' থেকে জানা যায় যে 'ছাত্রমিত্র' আসলে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম শিক্ষা-পত্রিকা। ইতিপূর্বে উক্ত উদ্ধৃতি থেকে তা সম্যক অনুধাবন করা যায়। কিন্তু 'সম্পাদকের পত্র' থেকে পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ চরিত্র এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। সম্পাদক এফ. বি গুইন জানান যে পত্রিকাটিতে 'বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের' উপকারে আসে এমন বিষয়াদিরই কেবল স্থানসংকুলান হবে। বিভিন্ন স্কুলের প্রাসঙ্গিক সংবাদাদি এবং 'পাঠ্য' 'ক্রীড়া' ও 'ব্যায়ামসমন্ধে' 'নানা শিক্ষা'ও এর উদ্দেশ্য। মাঝে মাঝে 'বিশ্রামদিন বা সপ্তাহের অন্যান্য দিবসোপযোগী নানা প্রকার প্রীতিজনক' গল্প ছাপবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সম্পাদকের পক্ষ হতে। পৃথিবীর নানা দেশের মহাপুরুষদের জীবনী ছাপা হবে যাতে বাংলার ছাত্ররাও 'মহত্ত্ব' লাভ করার প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে।


www.pathagar.com

'খেলিতে খেলিতে' কোনো বালক আকস্মিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হলে তার 'প্রতিকার' প্রদানের বিষয় ছাড়াও রয়েছে ছাত্রদের বিভিন্ন কাজে উৎসাহের বিষয়বস্তু। ইঞ্জিনিয়ার বা সূত্রধর, বাগানের কাজ, ফোটোগ্রাফি, গান গাওয়া, ঘোড়ায় চড়া, পশুপাখি পোষা ইত্যাদি 'বালকপ্রিয়' প্রসঙ্গও 'ছাত্রমিত্রে'র বিষয়সূচিতে থাকবে বলে সম্পাদক এই প্রথম সংখ্যায় আভাস দেন। চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগের জন্যে উৎসাহ দেয়া হয় 'ছাত্রমিত্র'র পাঠককে এবং তাদের জানানো হয় যে সম্পাদক প্রকাশিতব্য সংখ্যাগুলোয় এমন সব পথ বাতলে দেবেন যেগুলো অনুসরণ করলে জীবনে কৃতকার্য হওয়া যাবে। সবশেষের বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ ; সম্পাদকের স্বকণ্ঠ ঘোষণা অনুসরণ করছি—"আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এই পত্রিকা পাঠে পাঠাবস্থাতেই ঈশ্বরের সেবা করিতে ও তাঁহাকে ভয় ও মান্য করিতে শিক্ষা কর, ও দিন-দিন চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে পবিত্রতা লাভ করিতে সচেষ্ট হও।" চার্চ মিশনারি সোসাইটির বক্তব্যই পত্রিকা সম্পাদকের বরাতে প্রকাশিত—প্রভুভক্তি বা ঈশ্বরবিশ্বাসে জীবনের সার্থকতা।

'কী করা উচিত বা করিতে হইবে ?' শিরোনামে ক্রীড়ারত বালকদের আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিকারে প্রাথমিক শুশ্রূষার উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যাতে তারা 'হাসপাতালে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত' কিছুটা স্বস্তিতে থাকে।

'ইংরেজ সমাজে মিশিতে গেলে কিরূপে চলা উচিত ?' শিরোনামে কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এতে সমকালীন সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা এবং শাসকদের চরিত্র ও পরিমণ্ডল সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। লেখক দেশীয় হলেও তাঁর রচনা থেকে বোঝা যায় যে বিদেশী তথা শাসকশ্রেণীর মানুষদের সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা আছে। হয়ত লেখক নিজেও সি.এম.এস স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলীর একজন। রচনাটির সারমর্ম হচ্ছে সভ্যতা ও জাতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, দেশীয়দের কাছে যা 'অসভ্যতা' তা ইংরেজের কাছে সভ্যতা বলে গণ্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যেহেতু, লেখক বলছেন, "এখন তোমাদের ও ইংরেজদের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এখন তোমাদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজি ধরনে অভিবাদন করিতে ও ইংরেজি কায়দায় চলিতে ইচ্ছা করিয়া থাক।" এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ইংরেজি শিক্ষিত স্বদেশবাসী কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে টমাস ম্যাকলে কথিত 'মনে প্রাণে ব্রিটিশ' ধারণার অনুসারী। ভবিষ্যতের যুবকশ্রেণীর মধ্যে কীভাবে শাসকশ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধাভাব জাগানো যায় সেই চেষ্টাই রচনাটিতে মুখ্য। অনুমান করা অসঙ্গত নয় কথাটা লেখক মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করে থাকলেও সি. এম. এস স্কুল কর্তৃপক্ষের বেতনভোগী হওয়ার কারণে তাঁকে উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রচার করতে হয়। চার পৃষ্ঠাব্যাপী রচনাটির সর্বাপেক্ষা রসগ্রাহী অংশটি উদ্ধার করা যাক—


www.pathagar.com

"যখন কোন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও, তখন বাটী হইতে এক টুকরা কাগজে আপন নাম লিখিয়া লইয়া যাওয়া উচিত ; ও তাহা সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেও ; একেবারে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিও না, প্রকারান্তরে তাঁহাকে জানাইবার জন্য বাহির হইতে গলার শব্দ বা অন্য কোন শব্দ করিও না। তিনি ডাকিলে পর তাঁহার ঘরে গিয়া দিবসের সময় অনুসারে "Good Morning", "Good Afternoon", বা "Good Evening", বলিয়া অভিবাদন করিবে। বৈকালে "Good Morning" বলিলে ভয়ানক হাসির কথা। কোন কোন বাঙালি যুবক মনে করেন যে যখনই হউক প্রথম সাক্ষাৎকালে "Good Morning" বলিতে হয় ; কিন্তু এটী সম্পূর্ণ ভ্রম। তারপর সাহেবের সহিত যদি বিশেষ আলাপ না থাকে, তাহা হইলে অন্য পাঁচ কথা না বলিয়া যে কার্য্য উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছ, সে বিষয় উত্থাপন করিবে। "Good Morning", "Good Afternoon", "Good Evening" প্রথম সাক্ষাৎকালে ও বিদায়কালে ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু "Good Day" ও "Good Night" কেবল বিদায় লইবার সময় ব্যবহার হইয়া থাকে। বিশেষ বন্ধুত্ব স্থলে "Good Bye" বলিয়া বিদায় লওয়া যায়। একজন সাহেবের সহিত কেবলমাত্র আলাপ থাকিলে, তাঁহাকে তাঁহার সংসারসম্বন্ধীয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বা "How are you" বলিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশ্ন করা অসভ্যতার চিহ্ন। সাক্ষাৎকালে তাঁহার বাটীতে যে সকল দ্রব্য দেখিতে পাও তাহা স্পর্শ করিও না, বা তাহার মধ্যে কোনটির মূল্য কত জিজ্ঞাসা করিও না।... ...

ইংরেজ সমাজে নাক, গলা বা মুখ দিয়ে কোন শব্দ করা বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দোলান অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি কোন সাহেবের সঙ্গে খাইতে হয়, তাহা হইলে সাবধান যেন চিবাইবার বা পান করিবার শব্দ না হয়। পান মুখে করিয়া বা ঠোঁট রাঙ্গা করিয়া ইংরাজের সমাজে যাওয়া নিষিদ্ধ। এদেশের লোকেরা 'বাহ্যা', 'প্রস্রাব' শব্দগুলি সমাজে ব্যবহার করিয়া থাকেন ; কিন্তু কোন ইংরেজ যদি তোমাদিগকে ঐসকল শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করিতে শুনেন তো তাহা হইলে তোমাকে যার পর নাই অসভ্য জ্ঞান করিবেন। একজন সাহেবের কাছে বসিয়া মেজ বা ডেস্ক বাজান, বা কানে কানে আর এক জনের সঙ্গে কথা কহা ইংরাজ সমাজে ভদ্রতার চিহ্ন নহে। কোন সাহেবের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা বা তাঁহাকে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করা তাঁহার পক্ষে অপমানকর।"


www.pathagar.com

কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উদ্ধৃত লেখাটি দীর্ঘ হলেও শাসক ইংরেজদের চালচলন অভ্যাস ইত্যাদি জানবার পক্ষে মূল্যবান। বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ দিকে যখন দেশীয় ও ইংরেজদের মধ্যে মেলামেশা সেরকম ব্যাপক হয়নি তখন লেখকের উক্ত পর্যবেক্ষণ ঐতিহাসিক দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ। লেখকের উপস্থাপনার ভঙ্গিতে এটি স্পষ্ট যে বাংলার শাসকশ্রেণী ও শাসিতদের মধ্যকার দূরত্ব সম্পর্কে তিনি বেশ সচেতন। রচনাটিতে প্রতিফলিত বক্তব্য থেকে এমন ধারণা জাগা স্বাভাবিক যে শাসক ইংরেজ স্থানীয়দের চেয়ে ওপরের আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং সে কারণে সম্মান মর্যাদা ভক্তি তাদের প্রাপ্য। সোজা কথায় এতে প্রভুভক্তিসুলভ অভিব্যক্তি স্পষ্ট। হয়ত সম্পাদকের বিশেষ পৃষ্ঠাপোষণায় নিবন্ধটি রচিত হয় এবং রচনাটির মাধ্যমে স্থানীয় ও বিদেশী তথা শাসকদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা প্রাধান্য পায়।

সর্বমোট ষোলো পৃষ্ঠার 'ছাত্রমিত্র' পত্রিকাটির অন্য রচনাগুলো মূলত দুই ধরনের—তথ্যমূলক ও উপদেশমূলক। 'দিব্য করা' বা 'গালাগালি দেয়া' যে ধর্ম ও নীতিবিরুদ্ধ সে বিষয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে 'দিব্য করা অনুচিত' রচনায়। ক্ষুদ্র হলেও যে কোনো বস্তু অবহেলার যোগ্য নয় সেটি বোঝাতে একটি তথ্যের উপস্থাপনা দেখি যা একই সঙ্গে তথ্য ও জ্ঞানের উৎস—"আট কোটি চল্লিশ লক্ষ আলপিনের একত্র মূল্য 'পোনের হাজার টাকা', কাজেই আলপিন অবহেলার বস্তু নয়।" 'পাঁচ ফুলে সাজি' শিরোনামে প্রকৃতিজগতের বিভিন্ন প্রাণী বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রচনা এবং সাধারণ জ্ঞান ও তথ্য কণিকা ইত্যাদি, ক্ষেত্রবিশেষে সচিত্র প্রতিবেদন সহকারে মুদ্রিত হয়েছে। 'প্রহেলিকা' শিনোনামে লোকপ্রচলিত ধাঁধার মাধ্যমে বালকদের বুদ্ধির পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। 'দুটি ফুল' শিরোনামে স্থান পেয়েছে আলফ্রেড রায় নামক 'আমাদের বিদ্যালয়ের একটি খ্রিষ্টান বালক'-এর মৃত্যুতে তার বন্ধুর উৎসর্গিত কবিতা। 'আপন জিহ্বাকে দমন কর' একটি নীতিকথামূলক রচনা। বলাবাহুল্য, মিশনারি সোসাইটির পৃষ্ঠপোষণায় প্রকাশিত পত্রিকায় ধর্ম-নীতিকথার প্রাধান্য থাকবে। 'ছাত্রমিত্র'-র প্রায় সব রচনাতেই ধর্ম ও নীতির সুর স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন। সর্বশেষ রচনায় 'অতি ক্ষুদ্র স্থানে' অবস্থিত হয়েও যে মানবদেহের জিহ্বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রত্যঙ্গ সেকথা প্রচারিত হয়েছে। জিহ্বা-উচ্চারিত কথা যে জগতে সুখ-দুঃখ ক্ষতি-বৃদ্ধির কারণ সে বিষয়ে নীতিকথা লিখেছেন 'জনৈক বালক'। মূল ষোলো পৃষ্ঠা ছাড়াও পত্রিকার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও শেষ প্রচ্ছদেও বিভিন্ন প্রকারের রচনা স্থান পায়। দ্বিতীয় প্রচ্ছদে 'দেখি কে পারে' শিরোনামে একটি অনুবাদ প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হয়েছে '১৮ বছরের অনধিক' বয়স্কদের জন্যে। অনুবাদের শর্ত হচ্ছে—"মূল ইংরেজিতে যত পংক্তি রয়েছে বাংলাতেও তত পংক্তি রাখতে হবে।" কবি হেনরি লংফেলোর 'এ সাম অব লাইফ' কবিতার ছত্রিশ পংক্তির সার্থক অনুবাদের জন্যে 'পারিতোষিক স্বরূপ একখানি পুস্ত


www.pathagar.com

ক' দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে বিজ্ঞাপনে। তৃতীয় প্রচ্ছদে 'খ্রীষ্টিয়ান বালকদের সম্বাদ' শিরোনামে কয়েকটি সংবাদ—যেমন, চার্চ মিশনারি সোসাইটির সেক্রেটারি 'ক্লিফর্ড সাহেব' বাংলা ছেড়ে লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছেন 'বিশপের পদে' যোগ দিতে। সর্বজনপরিচিত ক্লিফর্ড সাহেবের জন্যে 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা' কামনা করা হয়েছে রচনাটিতে। দ্বিতীয় সংবাদ থেকে জানা যায় ক্যাম্পবেল নামক একজন স্কুলহেডমাস্টার বিলেত থেকে ভারতে আসেন 'হাইদরাবাদ হাইস্কুলের হেডমাস্টার' হয়ে। তিনি নিজে ভালো সাঁতারু হওয়া সত্ত্বেও একদিন ত্রিশজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে সাঁতার কাটতে যান এবং তাদের মধ্যকার "একজন সাঁতার না জানা ছাত্রকে সাঁতার শেখাতে গিয়ে তিনি জলে ডুবে মারা যান"। সংবাদ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে এভাবে—"হে বালকগণ তবে দেখ তিনি তোমাদের মত একজনের জন্য আপন প্রাণ বিসর্জন করিলেন। ঠিক প্রভু যিশু খ্রীষ্টের ন্যায় তিনি অন্যের হিতার্থে প্রাণত্যাগ করিলেন।" তৃতীয় সংবাদটি 'চাপড়াপাড়া বোর্ডিং স্কুলের' ছাত্রদের একজন নতুন 'স্বতন্ত্র সাহেব' তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তির সংবাদ এবং একই সঙ্গে আরেকটি সুসংবাদ হচ্ছে 'তাহাদের প্রিয় জোন্স সাহেব' শীঘ্র কলকাতায় বদলি হয়ে আসছেন।

শেষ প্রচ্ছদে প্রকাশিত প্রতিবেদন আকারের সংবাদটি গুরুত্বপূর্ণ। এতে সমকালীন শাসিতদের প্রতি শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি বা অনুভূতি, শাসকদের স্বদেশে ভারতবর্ষ বা বাংলার মানুষদের সম্পর্কে ভাবনা ও সম্পৃক্ততার নানা তথ্য মেলে। আবার আজ থেকে প্রায় একশো চৌদ্দ বছর পূর্বে ভারতবর্ষে বাংলায় মিশনারি তৎপরতায় ব্রিটিশ শাসকদের স্বদেশবাসীদের ভূমিকার দিকটিও ছোট্ট এই রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। সবশেষে যা গুরুত্ববহ, ভারতবর্ষে শাসকদের ধর্মপ্রচারের অভিপ্রায় ও মহিমার প্রচারণা—

> "বিলাতের বালকগণ এদেশের বালকদিগকে কতদূর ভালোবাসে, ও কতদূর তাহাদের বিষয় চিন্তা করে, তাহা এদেশের বালকেরা জনে না। কয়েক দিন গত হইল একটী ইংরাজ বালক বাঙ্গালী বালকদের খেলিবার জন্য একখানি ব্যাট ও দুইটী ডম্বেল্ আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। আর একজনের একটি মুরগী আছে। বালকটি তাহার ডিমগুলি বেচিয়া যাহা পায়, তাহা এদেশের বালকদের জন্য পাঠাইয়া দেয়। তাহার ইচ্ছা এই যে ঐ টাকাতে ধর্ম্মপুস্তক ও অন্য ২ উত্তম পুস্তক ক্রয় করিয়া ইহাদিগকে দেওয়া হয়। আর একজন বালক আপন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট ভারতবর্ষ সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বক্তৃতা করে ; এবং ঐ উপলক্ষে কিঞ্চিৎ সামান্য টাকা সংগ্রহ করিয়া এদেশে পাঠাইয়া দেয়। আবার একজন বালক বিদেশীয় ডাকের টিকিট সংগ্রহ করে ও তাহা বেচিয়া যাহা পায়, তাহা এদেশে মিশন কার্য্যের সাহায্যে পাঠাইয়া দেয়। ইহাদেরই সকলেরই এই ইচ্ছা যে এদেশীয় বালকগণ বিলাতের বালকগণের মত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সেবক হয়।"


www.pathagar.com

ইংল্যান্ড থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে তা ভারতে পাঠানোর যে চিত্র উপর্যুক্ত রচনায় রয়েছে তাতে বিশ্বব্যাপী মিশনারি তৎপরতায় ব্যাপৃত চার্চ মিশনারি সোসাইটির কার্যক্রমেরই প্রতিফলন ঘটেছে। দয়া, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি মহৎ গুণের দৃষ্টান্ত দ্বারা অ-খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শাসকদের খ্রিষ্টধর্মের প্রতি অনুপ্রেরণা জাগাবার প্রচেষ্টা এতে সুস্পষ্ট।

'ছাত্রমিত্র'র প্রথম সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পত্রিকাটি মূলত স্কুলশিক্ষার্থীদের জন্যে প্রকাশিত। তরুণ ও কিশোরদের মানসিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়াদির নির্বাচনে একটা সুপরিকল্পনার ছাপ এতে পরিদৃষ্ট। ভবিষ্যতের যে সৃজ্যমান শিক্ষিত সম্প্রদায় সেকালে বাংলার স্কুল-কলেজে সমাবেশিত তাদের মনোজগতে জ্ঞাননির্ভর একটি অধ্যায় উন্মোচনের ঔৎসুক্য সহজেই অনুধাবনযোগ্য। তাছাড়া শিক্ষানির্ভর ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপযোগী নানা দিক সম্পাদকের সুচিন্তার পরিচায়ক। দ্বিতীয় সংখ্যাতেও তা অব্যাহত থাকে। এটির প্রকাশকাল ১৮৯২ সনের অক্টোবর। মাসিক পত্রিকার নিয়মানুযায়ী প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরের মাসেই এটির পুনরাবির্ভাব। এবারে দ্বিতীয় সংখ্যার বিষয়সূচির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক—(১) ছাত্রদের প্রতি জনৈক মহারাজের উপদেশ (২) বেলুন বা ব্যোমযান (৩) আশু প্রতীকার (৪) সর্প (৫) জর্জ স্টিফেন্‌সন্ (৬) অক্টোবর মাসের বিশেষ ঘটনা (৭) প্রেরিত পত্রের উত্তর (৮) ছাত্রদিগের পৃষ্ঠা।

'বেলুন বা ব্যোমযান' চার পৃষ্ঠাব্যাপী একটি বিজ্ঞান নিবন্ধ। এতে বেলুনে চড়ে আকাশে ওঠার প্রক্রিয়া এবং ভবিষ্যতে বেলুনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত স্থান পেয়েছে। এখানে স্মরণ প্রাসঙ্গিক যে উক্ত রচনার এক দশককাল পরে ১৯০৩ সনে অরভিল ও উইলবার রাইট ভাইয়েরা প্রথম সার্থকভাবে একটি যন্ত্রচালিত এরোপ্লেন উড্ডয়নে সক্ষম হন। নিবন্ধটিতে মানুষের উড্ডয়নক্ষমতা সম্পর্কে লেখক যে মন্তব্য করেন তা বিজ্ঞানের সমকালীন অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু মজার ব্যাপার বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে ঈশ্বর মাহাত্ম্যের বিবরণ জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে ধর্মের সঙ্গে আপাত সম্পর্কহীন বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাটির সমাপ্তি ঘটে চার্চ মিশনারি সোসাইটির আকাঙ্ক্ষানুসারে ঈশ্বরসমর্পণের মধ্যে—

> "মনুষ্য জাতির দেহভার এত অধিক যে, তাহাদের পক্ষে অধিক দূর শূন্যে উঠা বা অধিকক্ষণ শূন্যে থাকা অসম্ভব। বর্তমান জীবনে মনুষ্যকে ভূমণ্ডলেই থাকিতে হইবে। কিন্তু চিরকাল এরূপ হইবে না। শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যে, এই প্রবন্ধের প্রত্যেক পাঠককেই এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে হইবে যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাঁহাকে টানিয়া রাখিতে পারিবে না ; ও পৃথিবীতেও তাঁহাকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে না। জগতের সৃষ্টিকর্তা


www.pathagar.com

জগৎকে বিচার করিতে আসিবেন ; এবং সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঊর্ধ্বে উঠিবে। কেহ লুকাইয়া থাকিতে পারিবে না বা অন্য কোনো প্রকারে অব্যাহতি পাইবে না। মনুষ্য মাত্রেরই বিচার হইবে, ঈশ্বর ভক্তগণ পুরস্কৃত ও আদৃত হইবেন ; ও তাঁহার বিরুদ্ধাচারীরা তাঁহার নিকট হইতে তাড়িত হইয়া চিরস্থায়ী যন্ত্রণাভোগ করিবে।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে বেলুনের বিজ্ঞান প্রসঙ্গে রচনাকারী শেষ পর্যন্ত ধর্মকথিত স্বর্গ-নরকের ধারণায় উপনীত হয়েছেন। স্কুলের ছাত্র পাঠকরা লেখাটি পাঠ করে এমনটিও ভাবতে পারে যে ঈশ্বরের কাছে একদিন বেলুনে চড়েই পৌঁছানো যাবে যেহেতু স্বর্গ ঊর্ধ্বলোকে অবস্থিত। ধর্মপ্রচারণার এ কৌশল 'ছাত্রমিত্র'র অন্যান্য রচনাতেও লক্ষ করা যায়।

পরবর্তী চারটি রচনার প্রথমটি 'আশু প্রতীকার', রচয়িতা প্রাণধন বসু, এম-বি। ফুটবল খেলার সময় আঘাত পেলে করণীয় সম্পর্কে একটি নিবন্ধ এটি। 'সর্প' চারপৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ। এতে প্রাণীবিদ্যাশাস্ত্রমতে সাপের প্রকৃতি, সর্পদংশনে করণীয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু এ প্রবন্ধের সমাপ্তিও ঠিক পূর্ববর্তী বেলুন প্রবন্ধের ন্যায় ঈশ্বর মাহাত্ম্যে পর্যবসিত। সর্পদংশনের মারাত্মক দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করার পর লেখক উত্থাপন করেন ধর্মপ্রচার। সাপ থেকে ঈশ্বরের দূরত্ব যতই হোক অল্প বয়স্ক পাঠকদের জন্যে তিনি দুটোকে নিয়ে আসেন পরস্পরের সন্নিকটে—

"আর তুমি যদি খ্রীষ্টান হও তবে তোমার স্বর্গস্থ পিতার ক্ষমতা স্মরণে রাখিও। তিনি তাঁহার সন্তানদের ভালোবাসেন, এবং তাহাদের প্রার্থনা শুনেন।...তোমাকেই যদি সাপে কামড়ায় ; তাহা হইলে কি করিবে ? এক মিনিটের মধ্যে এরূপ ঘটিতে পারে। হয়ত খেলিতে খেলিতে হাতে বা পায়ে যেন কাঁটা ফুটিল এমন বোধ হইল। হইতে পারে ঈশ্বর তোমাকে আহ্বান করিলেন। এখনই তাঁহার কাছে যাইতে হইবে ; কিম্বা এমনও হইতে পারে, তুমি তাঁহাকে আরো স্মরণ করিবে বলিয়া তিনি তোমাকে এই বিপদে পড়িতে দিলেন। প্রিয় বালকগণ ! এরূপ ঘটনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাক।"

প্রসঙ্গত রচয়িতার রচনা কৌশলের কথা বলা যায় যা প্রশংসাযোগ্য। যাতে অন্যধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের আকস্মিক আবর্ভাবের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন না করতে পারেন সেজন্যে আগেই বলে দেন "তুমি যদি খ্রীষ্টান হও", অর্থাৎ রচনাটির ঐশ্বরিক পরিণতি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের জন্যেই কেবল প্রযোজ্য। 'জর্জ স্টিফেনসন বা রাখাল অবস্থা হইতে বিখ্যাত এঞ্জিনিয়র' ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জর্জ স্টিফেনসন-এর জীবন ও কর্মবিষয়ক রচনা ; দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে এটির ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু। স্টিফেনসন (১৭৮১-১৮৪৮) ১৮১৪ সালে প্রথম বাষ্পীয় রেল চালু করেন ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল-এর নিকটবর্তী কিলিংওয়ার্থ কলিয়ারি-তে। তিনিই বিশ্বের


www.pathagar.com

লৌহ রেল উদ্ভাবক—১৮২২ সালে প্রথম প্রবর্তিত এ লাইনটি স্টকটন-ডার্লিংটন লাইন নামে ইতিহাসখ্যাত। ১৮২৯-এ তাঁর রকেট নামক রেল ইঞ্জিন সেকালে পাঁচশো পাউন্ড পুরস্কার লাভ করে বিজ্ঞান উদ্ভাবনা'র স্বীকৃতিস্বরূপ। অনুপ্রেরণামূলক এ লেখায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্ঞানতৃষ্ণার দিকটিতে মনোযোগ লক্ষণীয়। 'অক্টোবর মাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনা'য় স্থান পেয়েছে ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দের এ মাসেই ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণকারী খ্যাতিমান ব্রিটিশ কবি 'ক্যান্টারবারি টেলস্' রচয়িতা জেফ্‌রি চসার-এর জীবন ও কর্মবিষয়ক প্রতিবেদন।

ছাত্রমিত্র'র প্রথম সংখ্যার ন্যায় দ্বিতীয় সংখ্যারও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও শেষ প্রচ্ছদে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে দ্বিতীয় সংখ্যায় কয়েকটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা থেকে এসময়কার স্কুলের অবস্থা, ছাত্রদের মানসিকতা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে কৌতূহল-সঞ্চারী ধারণা লাভ করা যায়। দ্বিতীয় প্রচ্ছদের 'ছাত্রদের প্রতি জনৈক মহারাজের উপদেশ' শিরোনামের রচনায় ধ্বনিত হয়েছে পত্রিকা সম্পাদক তথা চার্চ মিশনারি সোসাইটির হতাশা। পূর্ববর্তী মাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে কুচবিহারের রাজা বাহাদুরের 'জেনকিন্স' স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার বরাত দিয়ে বলা হয় যে রাজাবাহাদুর 'এদেশীয়' ছাত্রদের 'ধর্মবিষয়ে অনাদর' দেখে মর্মাহত। রাজার পরামর্শ, রচয়িতার মতে, দেশীয় ছাত্রদের জন্যে বিলেতি কায়দায় রোজ 'উপাসনালয়ে' যাওয়ার নিয়ম প্রচলিত করা প্রয়োজন। স্ব স্ব ধর্মের অনুসারী ছাত্রদেরকে তাঁর কথা মেনে চলার পরামর্শ দিয়ে উপসংহারে একটি নতুন উদ্যোগের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় প্রতিবেদন রচয়িতার পক্ষ থেকে—

> "কলেজের অধ্যক্ষকে প্রত্যহ কলেজ ও স্কুলবিভাগের কার্য্যারম্ভের পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিতে আদেশ দিলেন, ও কহিলেন প্রত্যেক শ্রেণীর বালকদের তাহাতে যোগ দিতে হইবে।"

সেটা গুরুত্বপূর্ণ, কুচবিহারের রাজা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী না হলেও তাঁর বক্তব্যকে চার্চ মিশনারি সোসাইটি গুরুত্বের সঙ্গে নেয় এবং অনুমান করা যায় শীঘ্র বাংলার স্কুলগুলোতে বিলেতি ধরনে প্রার্থনাসভার প্রচলন ঘটবে।

তৃতীয় প্রচ্ছদে 'প্রেরিত পত্রের উত্তর' পর্যায়ে 'ছাত্রমিত্র' সম্পর্কে পাঠক প্রতিক্রিয়া এবং সম্পাদকের জবাব মুদ্রিত হয়েছে। শ্রী বেহারীলাল মণ্ডল নামের জনৈক ছাত্র উত্থাপিত প্রশ্নটি পত্রিকার সূচনাসংখ্যার চরিত্র নির্ণয়ে এবং সামগ্রিকভাবে 'ছাত্রমিত্র'র দৃষ্টিভঙ্গি বিচারে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। সম্পাদক অবশ্য উত্থাপিত প্রশ্নটিকে না এড়িয়ে তাঁর পক্ষ থেকে যথোচিত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য—

> "কেবল খ্রিষ্টিয়ান বালকদিগের উপকার করা "ছাত্রমিত্রে"র উদ্দেশ্য নয়। যাহাতে বঙ্গীয় সকল ছাত্রের ব্যবহার উপযোগী হয়, তজ্জন্য আমরা বিশেষ


www.pathagar.com

চেষ্টা করিব। অনেক হিন্দু বালক "ছাত্রমিত্রে"র গ্রাহক হইয়াছে, এবং হয়ত তাহাদের কাহারও কাহারও বাইবেল নাই।"

শ্রী বেহারীলাল মণ্ডল নামক "ছাত্রমিত্র" পাঠকটির মনে এ প্রশ্নোদয়ের কারণ হয়ত বা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় সম্পাদকের বক্তব্য। পত্রিকাটির প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদকের অনেক কথার মধ্যে এমন কথাও ছিল যে,

"আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এই পত্রিকা পাঠে পাঠাবস্থাতেই ঈশ্বরের সেবা করিতে ও তাঁহাকে ভয় ও মান্য করিতে শিক্ষা কর, ও দিন দিন চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে পবিত্রতা লাভ করিতে সচেষ্ট হও।"

উপর্যুক্ত বক্তব্য পরবর্তী সংখ্যায় (২য় সংখ্যায়) যে খানিকটা নমনীয় হয়েছে তা একটি রচনার "তুমি যদি খ্রীষ্টান হও" সম্বোধন থেকে অনুমেয়।

তৃতীয় প্রচ্ছদে এছাড়াও মুদ্রিত হয়েছে প্রথম সংখ্যায় আহ্বান করা 'লংফেলো'র কবিতার অনুবাদ এবং পুরস্কৃতদের নামাবলি। পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে সম্পাদকের বিস্ময় ও হতাশা। হতাশার কারণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাল্পতা এবং সম্পাদক বিস্মিত, এজন্যে যে তাঁর ধারণা ছিল "বাঙ্গালী বালকদের পদ্য লিখিবার ইচ্ছা" বেশ প্রবল কিন্তু "ইংরেজি পদ্যটি কেবলমাত্র দুইজন বালকে ভাষান্তর করিয়াছেন।" সম্পাদক অবশ্য মনে করেন যে মূল কবিতাটি বোঝার পক্ষে খানিকটা কঠিন হওয়াটাই হয়ত প্রতিযোগীদের সংখ্যাল্পতার হেতু। সম্পাদকের বিস্ময় ও হতাশা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে মাতৃভাষায় পদ্য রচনায় "বাঙ্গালী বালকগণ" যতটা উৎসাহ বোধ করবেন ইংরেজি অনুবাদে ততটা উৎসাহ তাঁদের না-ও থাকতে পারে। যাহোক, প্রতিশ্রুত চার টাকা পুরস্কার দুজন ছাত্রের মধ্যে সমান ভাগে বণ্টনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং পুরস্কৃত ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটুকুও লক্ষণীয়—(১) শ্রী শামূয়েল বিশ্বাস। সি. এম. এস. বোর্ডিং স্কুল, কলিকাতা (২) শ্রী যোগীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, চট্টগ্রাম কলেজ। শেষ প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয়েছে পূর্ববর্তী মাসের বা প্রথম সংখ্যার 'প্রহেলিকা'র উত্তর ও নতুন প্রহেলিকা এবং উত্তরদাতাদের নাম।

'ছাত্রমিত্র'র ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যার বিষয়সূচিতে খানিকটা নতুনত্ব বা নতুন সংযোজন সন্নিবেশিত হয়। সে বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে বিষয়সূচিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক—(১) ছাত্রদিগের পৃষ্ঠা (২) বৃক্ষ ও চারাসকল (৩) ইংরাজসমাজে মিশিতে গেলে কিরূপে চলা উচিত (৪) আশু প্রতীকার (৫) জর্জ স্টিফন্‌সন্‌ (৬) 'শীতে মৃত' (৭) গবর্নমেন্ট অফিসে কর্ম প্রার্থনাকারীদের পরীক্ষা (৮) পাঁচ ফুলে সাজি (৯) নভেম্বর মাসের বিখ্যাত ঘটনাবলি।

'ছাত্রমিত্র' যে বহিরাগত ইংরেজ এবং দেশীয়দের মধ্যে আদান-প্রদানের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নেয় তা ৩য় সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট 'ইংরাজ সমাজে মিশিতে


www.pathagar.com

গেলে কিরূপে চলা উচিত' রচনা থেকে বোঝা যায়। বাঙালি সমাজের নানা অসম্পূর্ণতা, দোষত্রুটির অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ এবং পাশাপাশি ইংরেজদের সংস্কৃতির সঙ্গে তার তুলনা লেখাটির উপজীব্য বিষয়। যেমন, বর্তমান সংখ্যায় আলোকপাত করা হয়েছে বাঙালির চক্ষুলজ্জা সম্পর্কে। লেখকের ধারণা চক্ষুলজ্জার কারণে বাঙালির কথা-কাজে অমিল ঘটে। তাঁর আশা যে বাঙালি ভবিষ্যতে তার এ দুর্নাম দূর করতে সক্ষম হবে এবং ইংরেজদের মনে বদ্ধমূল এই ধারণার পরিবর্তন ঘটবে। পূর্ববর্তী সংখ্যার ন্যায় এবারেও স্বাস্থ্য বিষয়ক রচনা নিয়ে হাজির হন প্রাণধন বসু এম. বি। শরীরে দুর্ঘটনাবশত আকস্মিক রক্তপাতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ রয়েছে তাঁর রচনায়। মানবদেহ এবং এতে রক্তের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর ছাত্রোপযোগী ভাষাভঙ্গিটি বেশ আকর্ষণীয়—

> "যেরূপ বহুবাজারের জলের কল হইতে পরিষ্কৃত জল নল (Pipe) সহযোগে বাটীতে বাটীতে পৌঁছিয়া থাকে, তদ্রূপ হৃদযন্ত্র হইতে শিরার মধ্য দিয়া শরীরের সমস্ত প্রদেশে রক্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে।"

'শীতে মৃত' লেখাটিতে ফরাসি ভাস্কর 'ব্রিয়্যান্টিসের' মৃত্যুমুহূর্তের বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় সংখ্যার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় "গবর্নমেন্ট অফিসে কর্ম প্রার্থনাকারীদের পরীক্ষা"। এতে ব্রিটিশ-উদ্বোধিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলার স্কুল কলেজে যেসব বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচ্য হত তারও একটি রূপরেখা এতে ধরা পড়ে। সর্বোপরি ইংরেজসৃষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদ্যালয় পর্যায়ে সার্বিক পাঠ্যসূচি ও পাঠপ্রক্রিয়া সম্পর্কেও অনেকখানি জানা যায় এ থেকে। ঐতিহাসিক ও শিক্ষা প্রাসঙ্গিক রচনাটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

> "গবর্নমেন্ট অফিসে দুই শ্রেণীর কেরানী" পদের জন্যে চাকরি প্রার্থীদের দরখাস্তের নমুনা ও নিয়মাবলী (পরীক্ষার)। ১। শ্রুত লিখন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম-প্রার্থিগণ কিরূপ লিখিতে পারেন, তাহারও পরীক্ষা হয়।
>
> এইটি প্রথম পরীক্ষা, আর কোনো ব্যক্তি ইহাতে শতকরা ৭৫ মার্ক না পাইলে অপর অপর পরীক্ষা দিতে পারেন না।
>
> ২। ইংরাজি রচনা।
>
> ৩। চিঠিপত্রাদির মর্ম সংক্ষেপে লিখন—প্রথম শ্রেণীর কর্ম প্রার্থীদের ইহা ছাড়া নিজ বুদ্ধি হইতে পত্রাদি লিখিতে হয়।
>
> ৪। ভূগোল।
>
> ৫। ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস।


www.pathagar.com

৬। অঙ্ক {প্রথম শ্রেণীর জন্য—সমস্ত পাটীগণিত, বীজগণিত, মিশ্র সমীকরণ, ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত।

{দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য—পাটীগণিত, বীজগণিত, সরল সমীকরণ, ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ে শতকরা ২৫; ও অন্যান্য অবশিষ্ট বিষয়ে শতকরা ২০ মার্ক না পাইলে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।"

এরপরেই একটি নমুনা দেয়া হয়েছে ইংরেজি পত্রের, পত্রটি ফোর্ট উইলিয়ম-এর পরীক্ষা পরিষদের সেক্রেটারি বরাবর লেখা।

'পাঁচ ফুলে সাজি'তে বরাবরের মতো বিচিত্র বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞানকে সমন্বয়ের চেষ্টা লক্ষণীয়। বর্তমান সংখ্যায় তিনটি আকর্ষণীয় বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথমটাতে বেদে সম্প্রদায় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। উদ্ধারযোগ্য অংশ—

"আমরা সকলে বেদে দেখিয়াছি। তাহারা শহরের নিকটস্থ মাঠে ছেঁড়া ময়লা ক্যাম্বিসের গামুতে বাস করে। বেদে জাতিকে সমস্ত জগতে দেখা যায়। ইংল্যান্ডে ঐ জাতিকে (Gipsy) (জিপসি) বলে। গণনা করা হইয়াছে যে পৃথিবীতে দশ লক্ষ বেদে আছে। তাহাদের ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা আর্য্যভাষামূলক। সম্ভবত ভারতবর্ষই তাহাদের জন্মস্থান।"

দ্বিতীয়টি একটি উপদেশমূলক রচনা কিন্তু এতে গণিতের সূত্র ব্যবহৃত—

"প্রায় এক সের ওজনের লৌহেতে ঘোঁড়ার লাল নির্ম্মাণ করিয়া বেচিলে তাহার মূল্য প্রায় ৩০ টাকা হইতে পারে। কিন্তু ঐ লোহাতে যদি ঘড়ির স্প্রিং নির্ম্মাণ করা যায় তাহা হইলে তাহার মূল্য সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। এখানে দেখা যাইতেছে যে উভয় স্থানেই সেই এক লৌহ খণ্ড লইয়া কার্য্য হয়। তবে মূল্যের এত প্রভেদ কেন ? ইহার কারণ এই যে দ্রব্য সকলের মূল্য তাহাদের উপকারিতার উপর ও তাহাদের নির্ম্মাণ কালে যে সময় পরিশ্রম ও নৈপুণ্য আবশ্যক হয়, তাহার উপরে নির্ভর করে।... যে বালক এক্ষণে আলস্যে কাল কাটাইতেছে সে বড় হইলে তাহাকে কেহই তো মাসে ছয় টাকার অধিক মাহিনা দিবে না ; কিন্তু সে যদি যত্নবান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আপনার বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করে, তাহা হইলে তাহারও ছয় টাকার বিংশতি গুণ বেতন হইবার অসম্ভব নহে।"

সর্বশেষ রচনাটিতে বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে দুশো বছর পরে (অর্থাৎ ২০৯২ সনে) পৃথিবীতে ইংরেজি জানা লোকের সংখ্যা দাঁড়াবে একশো তিরাশি কোটি বাহাত্তর লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশো। হিসাবটি কিসের ভিত্তিতে বা কী নিয়মে কৃত সে বিষয়ে অবশ্য কোনো কথা নেই।


www.pathagar.com

প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যার (ডিসেম্বর ১৮৯২) বিষয়সূচি নিম্নরূপ—(১) ছাত্রদিগের পৃষ্ঠা (২) অন্ধতা (৩) ইংরাজি চলিত বাক্য বা প্রবাদসকল (৪) ঈশ্বরের নাম বৃথা লইও না (৫) ইংল্যান্ডে খ্রিষ্টের জন্মদিন পালন ও শীতকালের অন্য অন্য আমোদ (৬) বিলাত হইতে কলিকাতামুখে স্টীমারে যাত্রা (৭) পাঁচ ফুলের সাজি (৮) চক্ষুরত্ন মহারত্ন। বর্তমান সংখ্যার ৪-সংখ্যক বিষয়টি মনোযোগের দাবিদার। ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কিত নীতিকথা এটির মূল উপাদান হলেও রচয়িতা সমাজপ্রচলিত কিছু রীতিনীতির সমালোচনা করেছেন। লেখকের পরামর্শ হচ্ছে ঈশ্বরের নামের পবিত্রতা নষ্ট না করে তাঁকে স্মরণ করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। উদ্ধৃতি—

> "বিদ্যালয়ের বালকদের মধ্যেও দেখা যায়, যে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরীক্ষার সময় যেসকল কাগজে উত্তর লিখে, তাহার শিরোভাগে "ঈশ্বর দয়া করুন", "God", "God be gracious" প্রভৃতি কথা ব্যবহার করে। এ অতি দোষাবহ। কারণ অনেক স্থলে তাহারা পরীক্ষকের সন্তোষ জন্মাইবার জন্য এরূপ করিয়া থাকে। মনে ভক্তির লেশমাত্র থাকে না।... এদেশে হিন্দু, মুসলমান ও কতক পরিমাণে, খ্রীষ্টানেরাও কখন কখন অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরের নাম বৃথা লইয়া থাকেন। এমন কি যখন তাঁহারা মনে করেন যে ঈশ্বরের গৌরব করিতেছেন, তখনই তাঁহারা এই দোষে দোষিত হয়েন। এখানে আমি হিন্দুদিগের মধ্যে মালা জপার, ও ভগবানের নাম লইয়া যাত্রা গাওয়ার, মুসলমানদের মধ্যে "হা আল্লা হা আল্লা" বলিয়া ভিক্ষা করার, ও খ্রীষ্টিয়ানদের খ্রীষ্টসঙ্গীত লইয়া বৈঠকি গান করা বা "য়ুষফের পালা" প্রভৃতি যাত্রা রচনা করিয়া গাওয়ার পদ্ধতিগুলির উল্লেখ করিতেছি। এসমস্ত ব্যাপারে আন্তরিক ভক্তি অতি বিরল। আর বলা বাহুল্য যে ঐরূপ অবস্থায়, অর্থাৎ ভক্তিশূন্য হৃদয়ে ঈশ্বরের নাম লইলে তাঁহার অবমাননা করা হয়। ঈশ্বরের নাম বড় আদরের নাম, আর সেই নাম জিহ্বাতে লইবার সময়, তাঁহাকে হৃদয়াসীন করিতে হয়।"

এরপরের বিষয় ইংল্যান্ডে ক্রিসমাস উদযাপনের ঘটনা থেকে জানা যায় যে ক্রিসমাসে তুষারপাত হলে বালক-বালিকারা যারপরনাই আনন্দ পায় এবং তারা উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে খেলাধুলায়। কিন্তু এ তথ্যও জানানো হয়েছে যে নাগরিকদের প্রত্যেককে সেখানে নিজ নিজ বাসভবনের সামনে থেকে নিজ দায়িত্বে বরফ পরিষ্কার করতে হয় এবং কেউ বাড়ি বা দোকানের সম্মুখস্থ 'পাকা রাস্তা' থেকে সকাল দশটার আগে বরফ পরিষ্কারে ব্যর্থ হলে তাকে জরিমানা পরিশোধ করতে হয়।

চতুর্থ সংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'বিলাত হইতে কলিকাতাভিমুখে স্টীমারে যাত্রা'। এটি একই সঙ্গে ভ্রমণ কাহিনী এবং সৃজনশীল রচনা। রচয়িতার


www.pathagar.com

নামবিহীন রচনাটির লেখক সম্ভবত পত্রিকা সম্পাদক স্বয়ং। তাঁর বর্ণনাটি বেশ চিত্রময়, বাস্তবানুগ এবং কাব্যগুণসম্পন্ন। লেখাটিতে সেকালে সুদূর ভারতবর্ষের পথে পাড়ি দেওয়া ব্রিটিশ নাগরিকের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। শাসকদের দেশ থেকে শাসিতদের দেশে আগমন আনন্দ বেদনার এক মিশ্র অনুভূতির কাহিনী। খানিকটা উদ্ধৃতি দেয়া যাক—

"১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর আমার চিরকাল মনে থাকিবে। সেইদিন আমার ইংল্যান্ডে শেষ অবস্থিতি। টেমস নদীর ধারে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা ভুলিতে পারিব না। শত শত লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কত মাতা তাঁহাদিগের কন্যাগণকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতেছিলেন, এবং কত পিতা প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের পুত্রদের করমর্দন করিতেছিলেন। এ সমস্ত ব্যাপারের কারণ কী ?

কারণ এই যে লন্ডন হইতে একখানি বড় স্টীমার ভারতবর্ষে আসিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তাহাতে আরোহণ করিয়া অনেক লোক আপন বাটী ও স্বজনবর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে গমন করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত আর ফিরিয়া আসিবে না। কেহ বা অনেক বৎসর বিদেশে অতিবাহিত করিয়া পুনর্বার স্বদেশে আসিতে পারিবে। তবে যে জনতা ছিল, তাহার মধ্যে আমার স্নেহাস্পদ পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী ও বন্ধুগণ ছিলেন। কতকগুলি বালকও তথায় আসিয়াছিল, এবং বিদায়কালীন আমি যেরূপ মর্মাহত হইয়াছিলাম, তাহারাও সেইরূপ হইয়াছিল।"

'পাঁচ ফুলের সাজি' থেকে জানা যাচ্ছে যে বাংলার 'নব্য সম্প্রদায়ের' মধ্যে শারীরিক ব্যায়ামের চর্চা হচ্ছে। সম্পাদককথিত এই নব্য সম্প্রদায় হচ্ছে ব্রিটিশসৃষ্ট স্কুল-কলেজপড়ুয়া যুবকদল। এছাড়া ফুটবল-ক্রিকেট প্রভৃতি 'ইংরাজি খেলায়' তাদের ব্যাপৃত দেখে অশেষ আনন্দ বোধ করছেন রচনাটির লেখক।

প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যার (জানুয়ারি ১৮৯৩) বিষয়সূচি নিম্নরূপ—(১) ছাত্রদিগের পৃষ্ঠা (২) পরীক্ষার সময়োপযোগী কয়েকটি পরামর্শ (৩) ফিরে কি আসিছে পরীক্ষার কাল ? (৪) জানুয়ারি মাসের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী (৫) পাঁচ ফুলের সাজি (৬) জর্জ স্টিফন্‌সন্ (৭) সম্পাদকের পত্র (৮) পুরস্কার ! পুরস্কার ! পাঁচ টাকা। বর্তমান সংখ্যার দুই সংখ্যক বিষয়টি চিত্তাকর্ষক। রচনাটি ছাত্রদের জন্যে, ছাত্রদের কথা মনে রেখে রচিত। চার পৃষ্ঠাব্যাপী লেখাটিতে ছাত্রদের মধ্যে পরীক্ষাভীতি, পরীক্ষার সময়ে তাদের মধ্যে বিরাজমান সমস্যা এবং পরীক্ষা সন্নিকটে এলে করণীয় সম্পর্কে পর্যালোচনা মুখ্য। ছাত্রদের উপযোগী পরামর্শগুলো বস্তুনিষ্ঠ এবং তা ছাত্রদের মঙ্গলকল্পে উত্থাপিত। কিন্তু এতে তুলনামূলক বিচারে দেখানো হয়েছে যে ভারতবর্ষের ছাত্রদের চাইতে ব্রিটিশ ছাত্ররা শ্রেয়। এটা মনে


www.pathagar.com

রাখা দরকার যে বিলাতি ছাত্ররা তাদের পরীক্ষাসমূহ তাদের মাতৃভাষাতেই দেয় কিন্তু বাংলায় বা ভারতবর্ষে ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে হয় একই সঙ্গে স্থানীয় এবং শাসকদের ভাষায়। রচনার উদ্ধৃতি থেকে ছাত্রদের লেখাপড়া, পরীক্ষাকালীন অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের তথা শিক্ষকের দৃষ্টিকোণটি লক্ষ করা যেতে পারে—

"পরীক্ষাকাল যত নিকটস্থ হয়, ততই এদেশের ছাত্রগণ অধিক পরিশ্রম করিতে থাকেন। এমন কি উহার দুই চারি দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা আবশ্যক বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যকর ব্যায়ামাদি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অনবরত পড়িতে থাকেন ও ইহাতে তাঁহাদের পরিপাক শক্তির হ্রাস, এবং শরীর মধ্যে নানা ব্যাধির বীজ রোপিত হয়। কেহ কেহ আবার রাত্রি জাগরণ করিতে পারিবেন বলিয়া চা, কফি, তামাক, চুরুট এত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেন যে তাঁহাদের স্নায়ুরোগ জন্মে। এইরূপে কোনো সময়ে জনৈক যুবক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটি পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথম দিন ভালোয় ভালোয় কাটিয়া গেল। কিন্তু দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্নে প্রশ্নের উত্তর লিখিতেছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, কানের ভিতর শত শত উইচিংড়া ডাকিতে, ও সর্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল ও অনতিবিলম্বে তিনি জ্ঞানশূন্য হইলেন। এইখানেই তাঁহার সে বৎসরের পরীক্ষার শেষ হইল। বিলাতের ছাত্রগণ পরীক্ষার পূর্বের অন্তত এক সপ্তাহ গুরুতর মানসিক কার্য পরিত্যাগ করিয়া, চতুর্দিকে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সদালাপ দ্বারা আপনাদের শরীর ও মনকে প্রফুল্লিত রাখেন আর পূর্ব্বকার পরিশ্রমজনিত শরীরের যদি কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা পূরণ করিয়া সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দ মনে পরীক্ষায় উপস্থিত হয়েন। আমাদের মতে এদেশের যুবকদেরও এইরূপ নিয়মে চলা উচিত। যিনি এক বৎসর ধরিয়া কোনো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তিনি যদি এক সপ্তাহ অধিক পড়াশুনা না করেন তাহা হইলে, তাঁহার কোনো ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। আর যিনি এক বৎসর পরিশ্রম করিয়াও প্রস্তুত হইতে পারেন নাই, তাহার আর এক সপ্তাহ পড়িলেই বা কী হইবে ?"

কৃষ্ণদাস ব্যানার্জি রচিত উপর্যুক্ত রচনাটি ছাড়াও স্কুল-কলেজের পরীক্ষা এবং ছাত্রজীবনের করণীয় ইত্যাদি বিষয় বর্তমান সংখ্যায় যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। 'ফিরে কি আসিছে পরীক্ষার কাল' শিরোনামে প্রকাশিত শ্রী রমেশচন্দ্র রায় রচিত সনেট-আঙ্গিকের কবিতাটিও তার সাক্ষ্য। সম্পূর্ণ কবিতাটির উদ্ধৃতি—


www.pathagar.com

"ফিরে কি আসিছে পরীক্ষার কাল,
মিশি যাব সবে, এ ছাত্র জীবনে,
মেধা পরিশ্রম—এ সবার ফল
হেরিব আমরা সকলের নয়নে ?
ভীষণ সংসার সমর-আভাস ?
ছাত্র-জীবনের বার্ষিক-সংগ্রাম,
আসিছে কি পুনঃ নিম্ন-কারাবাস
হইতে মোরিয়া, দিতে উচ্চ স্থান ?—
ধৈর্য্য বাঁধ বুক—দূর কর ভয়—
ঈশ-পদে সবে মাগহ আশ্রয় !"

সনেট বলা হলেও কবিতাটি দশ পঙক্তির এবং এর ছন্দবিন্যাসও সনেটসম্মত নয়। তবে কবিতাটিতে ছাত্র মানসিকতা এবং স্কুল-কলেজের পরীক্ষা পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে বেশ সুন্দরভাবে।

'পাঁচ ফুলের সাজি' পর্যায়ে কলকাতাবাসীদের মধ্যে ঘোড়দৌড়ে আগ্রহের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে সতর্কতা রচনাটির বিশেষত্ব। এটি যে খেলা ছেড়ে 'জুয়া'র দিকে মোড় নেয় এবং অনেক সময় ভয়ঙ্কর পরিণাম ডেকে আনে সে বিষয়ে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন লেখক। সর্বোপরি, "ঘোড়দৌড়ের মাঠ অপেক্ষা অধিক কুৎসিত স্থান প্রায় আর কোথাও দেখা যায় না। এখানে এত দুষ্ট লোক একত্রিত হয়, ও এরূপ দুষ্টাচার দেখা যায় যে, বালকগণের এ প্রকার স্থানে না যাওয়া কর্তব্য।" ছাত্রদের পত্রিকায় ঘোড়দৌড় প্রসঙ্গের গুরুত্ব থেকে বোঝা যায় সমকালীন নগরজীবনে তথা কলকাতায় ঘোড়দৌড় খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তখন এবং এখনো বিলেতে ঘোড়দৌড়ের তুমুল জনপ্রিয়তার প্রেক্ষাপটে লেখক কথিত 'দুষ্টাচার' শব্দটি কূটাভাস বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে ঘোড়দৌড়ের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগানোর চেষ্টাটি নিঃসন্দেহে শিক্ষামূলক ও প্রশংসনীয়।

'সম্পাদকের পত্র' থেকে 'ছাত্রমিত্র' পত্রিকার ক্রমোন্নতি সম্পর্কে কিছু ধারণা মেলে। এটা বুঝতে পারা যায়, পত্রিকার চারটি সংখ্যা প্রকাশের পর মাসিকটির ভাগ্যে পাঠকপ্রিয়তা জুটেছে। তাছাড়া এ ধরনের অন্য কোনো পত্রিকা না থাকায় স্কুল-কলেজের ছাত্রদের পত্রিকাটির জন্যে আগ্রহী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। কাজেই সম্পাদক পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী এবং 'আরো ভালো' করবার ইচ্ছে থাকে তাঁর। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে তিনি প্রকাশিতব্য প্রবন্ধসমূহের সঙ্গে 'ভালো ভালো ছবি' ছাপবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। "বিলাত হইতে অনেক ছবি" সংগ্রহের কথা জানাচ্ছেন সম্পাদক ফ্র্যাংক বি গুইন। পরবর্তী সময়ে 'ডফ সাহেবের কলেজের' অধ্যাপক টমসন লিখিত 'জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিষয় কতকগুলো


www.pathagar.com

প্রবন্ধ' পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত হবে এবং আরো জানা যাচ্ছে যে প্রথম বছরে (১৮৯২ সনে) পত্রিকাটির প্রায় এক হাজার কপি বিক্রয় হয়েছে। সম্পাদকের আশাবাদ সংখ্যাটি ১৮৯৩-এ দ্বিগুণ হবে।

'ছাত্রমিত্র' শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা হলেও শিক্ষামূলক প্রসঙ্গ বা সমালোচনা ছাড়াও সৃজনশীল সাহিত্যের প্রতি মনোযোগ পত্রিকাটির একটি প্রশংসনীয় দিক। পত্রিকাটি ইতিপূর্বে ইংরেজি কবিতার অনুবাদ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। বর্তমান সংখ্যায় পাঁচ টাকা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিতে মৌলিক উপন্যাস রচনার প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। চার্চ মিশনারি সোসাইটির শিক্ষা ও সেবামূলক কার্যক্রমের পরিধিতে এটি নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। বিজ্ঞাপনটি আকর্ষণীয়—

"পুরস্কার ! পুরস্কার ! পাঁচ টাকা

যে কেহ বাঙ্গালা ভাষায় সর্বাপেক্ষা উত্তম উপন্যাস রচনা করিয়া আমাদিগের নিকট আগামী ২০শে মার্চ বা তৎপূর্বে পাঠাবেন, তাঁহাকে উপরোক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে। উপন্যাসটি স্বরচিত ও অভাব পক্ষে চার অধ্যায়ে বিভক্ত হওয়া আবশ্যক ; ও ইহাতে এদেশীয় আচার ব্যবহার বর্ণনা করিতে হইবে। ইহা কোনো বাস্তবিক ঘটনা সম্বলিত হইলে আরো ভালো হয়। উপযুক্ত বোধ হইলে উপন্যাসটি "ছাত্রমিত্রে" প্রকাশিত হইবে। লেখক কোনো আপত্তি করিতে পারিবেন না।"

পত্রিকার বিষয়সূচিতে নবতর সংযোজনা এবং এর গ্রাহক সংখ্যার ক্রমপ্রবৃদ্ধি এই দুই মানদণ্ডে বলা যায় 'ছাত্রমিত্র' পাঠকমহলে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া কোনোরূপ বিলম্ব বা অনিয়ম ব্যতিরেকে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশনাও পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করার কারণ বলে অনুমান করা যায়।

অতঃপর 'ছাত্রমিত্র'র পরবর্তী সংখ্যার (১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩) বিষয়সূচির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক—(১) ছাত্রদিগের পৃষ্ঠা (২) চন্দ্রেতে জীবজন্তু আছে কি না (৩) ফেব্রুয়ারি মাসের প্রধান ঘটনাবলী (৪) লন্ডন হইতে কলিকাতা পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা (৫) ফেব্রুয়ারি মাসের প্রহেলিকা (৬) ভয়ঙ্কর লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট বামন (৭) বাসানির্মাণ (৮) পাঁচ ফুলে সাজি। আগের সংখ্যার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'ডফ্ কলেজের' শিক্ষক আলেক্সান্ডার টমসনের রচনা প্রকাশ শুরু হয় বর্তমান সংখ্যা থেকে, তারই একটি হচ্ছে বিজ্ঞান নিবন্ধ 'চন্দ্রেতে জীবজন্তু আছে কি না'। 'ফেব্রুয়ারি মাসের প্রধান ঘটনাবলী' শিরোনামে বেছে নেয়া হয়েছে ১৭৫৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধের ঘটনা। রচনাটি ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। চারপৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধটিতে ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমন, তৎকালীন নবাবদের চারিত্রিক বিবরণ, নবাব সিরাজদ্দৌল্লার চরিত্রের নানা দিক, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জড়িয়ে পড়ার কারণ ইত্যাদি


www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তবে পুরো বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে ইংরেজ দৃষ্টিকোণ থেকে। বাস্তবিক তথ্যের সন্নিবেশে প্রবন্ধটি রচিত হলেও এতে শাসকের অবস্থান থেকেই পলাশীর যুদ্ধের মূল্যায়ন করা হয়েছে। সেজন্যে এটিকে পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ না বলে পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট রচনা বলা সঙ্গত। গুরুত্ব বিচারে এ থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি অনুসরণ করা যাক—

"৫ই—১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ। মুর্শিদাবাদের নবাব সেরাজুদ্দৌল্লা ইংরাজদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিল। এবং তাহার জঘন্য আচরণে প্রায় সমস্ত প্রজাই বিশেষরূপে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কতিপয় উচ্চপদস্থ লোক উহাকে পদচ্যুত ও মীর জাফরকে নবাবপদে অভিষিক্ত করিতে একটা ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরাজ বণিক কর্মচারীদের নিকট আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এবং ইংরাজেরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শত্রুদমনেচ্ছায় নবাব বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া পলাশীতে আসিয়া ছাউনি করিয়া রহিলেন। ঐদিন সন্ধ্যার সময় ইংরাজসৈন্য পলাশী হইতে একমাইল দূরে একটি আম্রবাগানে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রিযাপন করিল। সূর্য্যোদয়ে ৪০,০০০ তরবারি ও বড়শাধারী পদাতিকে ও ১৫,০০০ হিন্দুস্থানী অশ্বারোহী যোদ্ধাতে গঠিত নবাবের সৈন্য, ৫০টি বড় বড় কামান সম্বলিত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রত্যেক কামান টানিবার জন্য দুইটি শ্বেত বলদ ও ঠেলিবার জন্য একটি হস্তী নিয়োজিত ছিল। ক্লাইবের সৈন্যসংখ্যা ৩০০০ মাত্র, উহারা সকলেই ইংরাজি প্রণালীতে শিক্ষিত ও ইংরাজ অধ্যক্ষগণ দ্বারা চালিত। এবং তন্মধ্যে ১০০০ গোরা সৈন্য ছিল। যুদ্ধারম্ভে উভয় পক্ষই কামান ছুড়িতে লাগিল ; কিন্তু ইংরাজদের কামানের নিকট শত্রুগণ স্থির থাকিতে পারিল না। নবাবের অনেক বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ পতিত এবং সমস্ত সৈন্য ছিন্নভিন্ন হওয়াতে, তিনি তাহাদিগকে পশ্চাতে হঠিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। ক্লাইব এই সুযোগে আপনার দলবল লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে নবাবের সমস্ত সৈন্য পরাজিত হইল ও ইংরাজেরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন। ইহাদের সৈন্যের কেবল ২২ জন মরিয়াছিল ও ৫০ জন আহত হইয়াছিল।"

'পলাশীর যুদ্ধ' রচনাটির প্রধান গুণ এর বর্ণনভঙ্গি। যুদ্ধের কাহিনীটি এমনভাবে বর্ণিত যেন তা রচয়িতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অংশ। পলাশীর যুদ্ধের একশো ছত্রিশ বছর পরেও যুদ্ধপরিস্থিতির চিত্রাঙ্কনে এটি সার্থক। রচনাটিতে লেখকের নাম না থাকায় তিনি বাঙালি না ইংরেজ তা বলা মুশকিল। তবে এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় ইনি 'ছাত্রমিত্র'-গোষ্ঠীরই একজন লেখক এবং হয়ত এরি মধ্যে পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলোতেও তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়।


www.pathagar.com

'পাঁচ ফুলের সাজি' অংশে স্থান পেয়েছে তিনটি নির্বাচিত ঘটনা যার প্রথমটি থেকে 'ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ' সম্পর্কে কিছু ধারণা মেলে। সংবাদ প্রসঙ্গে প্রতিবেদকের মন্তব্য "ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ সহজে ছাড়ে না"। এটি মাদ্রাজের একজন ছাত্রের বি.এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ যে কিনা 'এগার বার ফেল্ হইয়া' শেষে পরীক্ষা পাসে সক্ষমতা লাভ করেছে। সংবাদের অন্তিম মন্তব্যটুকু সত্যনির্ভর হলেও কৌতুকপ্রদ—"উপরিউক্ত ব্যক্তি বার বার ফেল হওয়াতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার সাহসের জন্য তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক।" দ্বিতীয় সংবাদটিকে জানা যাচ্ছে সত্তরোর্ধ মহারানী ভিক্টোরিয়া'র 'হিন্দুস্থানী' ভাষা শেখার তথ্য। বিলাতের 'স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে'র বরাত দিয়ে জানানো হয় যে মৌলবি রফিউদ্দিন আহমদ নামে একজন শিক্ষকের কাছে তিনি উক্ত ভাষা শিখছেন। এতে এও বলা হয় যে মহারানী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভিন্ন একটি ভাষা শিখছেন। শোকদুঃখতাপ সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষণ অব্যাহত ছিল। এমনকি তিনি নবলব্ধ ভাষায় রোজনামচা রচনায়ও নিয়োজিত হন। মহারানী ছাড়াও রাজ পরিবারের আরেকজন সদস্য 'ডিউক অব কেন্ট'-এর হিন্দি ভাষা শেখার সংবাদ রয়েছে এ পর্বে। 'পাঁচ ফুলের সাজি' পর্যায়ের সংবাদ, তথ্য প্রভৃতির সূত্র ও বিবরণ এবং বর্তমান সংখ্যার বিলেতি 'স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন' সংবাদপত্রের সূত্র থেকে অনুমান করা সঙ্গত যে 'ছাত্রমিত্র'র অনেক রচনাই বিলেতে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে সংগৃহীত। সে অর্থে এটিকে আংশিকভাবে 'ডাইজেস্ট' পত্রিকাও বলা যায়। একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক যে যোগাযোগ ব্যবস্থার সেই পশ্চাদপদ যুগে একমাত্র জলযানেই বিলেত থেকে আসতে পারত সেখানে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা। সেক্ষেত্রে বিলেতে প্রকাশিত পত্রিকার দুই/তিন মাস পরেই হয়ত সংবাদসমূহ অনুবাদের সূত্রে পুনর্মুদ্রিত হত 'ছাত্রমিত্র'-এ।

সর্বশেষ রচনা চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র শ্রী যোগীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী অনূদিত লংফেলোর কবিতা 'জীবনসঙ্গীত'। স্মর্তব্য, এটি 'ছাত্রমিত্র' আয়োজিত একটি অনুবাদ প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত কবিতা। দ্বিতীয় প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যাচ্ছে যে পূর্ববর্তী মাসের উপন্যাস প্রতিযোগিতার পরিণতি পূর্বেকার কবিতানুবাদ প্রতিযোগিতার অনুরূপ। কারণ তখনও পর্যন্ত 'ছাত্রমিত্র'র দপ্তরে জমা পড়েছে মাত্র 'দুইটি প্রবন্ধ'। কাজেই প্রতিযোগিতার জন্যে সুযোগ দেওয়া হয় সময়-বৃদ্ধির।

'ছাত্রমিত্র'র প্রথম খণ্ড সপ্তম সংখ্যা'র (মার্চ ১৮৯৩) বিষয়বস্তু নিম্নরূপ— (১) ছাত্রদিগের পৃষ্ঠা (২) চন্দ্রস্থ আগ্নেয় পর্বতের অন্তরস্থ গুহা বা ক্রেটার (৩) সর্পবৃক্ষ (৪) লন্ডন হইতে কলিকাতা (৫) মার্চ্চ মাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী (৬) মার্চ্চ মাসের তিনটি যুদ্ধ (৭) নাইগেরার জলপতন (৮) হস্তী (৯) বৃক্ষ (১০) সন্তানের অনুরোধবশতঃ পিতার মুক্তি হওন।


www.pathagar.com

রচনাগুলোর চতুর্থটি পূর্বানুবৃত্তি, দ্বিতীয়টির রচয়িতা বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার লেখক আলেক্সান্ডার টমসন যিনি এরিমধ্যে 'ছাত্রমিত্র' পত্রিকার বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেখালেখিতে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এছাড়া নিউ ইয়র্ক ইভানজেলিস্ট সংবাদপত্র থেকে একটি সংবাদ গৃহীত হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে সন্তানের অনুরোধে কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছে অপরাধী পিতা। পত্রিকার শেষ প্রচ্ছদে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ইতিপূর্বে প্রকাশিত (প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩) 'ছাত্রমিত্র'র কাব্যানুবাদ প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর কবিতাটি।

'ছাত্রমিত্র'র প্রথম খণ্ড অষ্টম সংখ্যা (এপ্রিল ১৮৯৩) তথা এটির সমগ্র আয়ুষ্কালে প্রকাশিত সর্বশেষ সংখ্যার সূচিপত্র—(১) এপ্রিল মাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী (২) এন্ট্রেন্স পরীক্ষার ফল (৩) চন্দ্রলোক সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ দৃশ্য (৪) প্রথম দৈনিক পত্র ছাপা হওন (৫) ব্রিটিশ রাজ্যের মুকুট (৬) পুস্তক ! পুস্তক !! পুস্তক !!! (৭) চীনদেশীয় লোকদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৮) "Cleanliness is next to godliness." এ সংখ্যার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রচনা কৃষ্ণদাস ব্যানার্জির 'এন্ট্রেন্স পরীক্ষার ফল ও তদুপলক্ষে দুই একটি কথা'। রচনাটিতে সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রবেশিকা স্কুলসমূহের অবস্থা, শিক্ষা বিষয়টির হালহকিকত এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার ছাত্রদের বর্তমান-ভবিষ্যৎ ইত্যাদির এক বর্ণাঢ্য ও সমাজবিশ্লেষক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতিটি শিক্ষা ও সমাজ প্রসঙ্গে এবং ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ—

> "এ বৎসর অপেক্ষাকৃত অধিক ছাত্র পাস হইয়াছেন। তাঁহাদের নামের তালিকা দেখিয়া জানিলাম যে সর্বশুদ্ধ ৩৭২২ জন পাস, ইহার মধ্যে ৯৪৫ জন প্রথম, ১৯০১ জন দ্বিতীয়, ও ৮৭৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বড় আহ্লাদের বিষয় যে (Griffith) সাহেবের রেজিস্ট্রারি কার্যের প্রথম বৎসরে এরূপ সুখদায়ক ফল হইয়াছে। যেদিন পরীক্ষার ফল বাহির হয়, সেদিন কত বিদ্যালয়, কত বাটী আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কত হিন্দু রমণী আপনার পুত্র পাস হইয়াছে বলিয়া হরির লুট দিয়া আপনার মহানন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কত ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টীয় বাটী ও বিদ্যালয় ধন্যবাদসূচক উপাসনায় ও বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। কত গভর্নমেন্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক আর কিছুদিনের জন্য ইন্‌স্পেক্টরের আফিস্ হইতে ভয়প্রদর্শক পত্রাদি আসিবে না এই ভাবিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া আপন আপন ইস্কুলের হেড্‌মাস্টারের সুখ্যাতি, আর এমন হেড্‌মাস্টার নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া আপনাদের বিচক্ষণতার প্রশংসা করিতেছেন। কাহার কাহার বিদ্যালয় হইতে হয়ত ক্রমাগত তিন বৎসর একটিও পাস হয় নাই, আর এ বৎসর না হইলেই এড্ বন্ধ হইত। তাহাদের তো আনন্দের সীমা


www.pathagar.com

নাই। এ বৎসর তাঁহারা ভালো ফল দেখাইয়াছেন, এখন আর কিছুদিনের জন্য ভাবনা নাই। আগামী দুই তিন বৎসর কেহ বিদ্যালয় হইতে পাস না হইলেও এ বৎসরের দোহাই দিয়া কাটাইতে পারিবেন। এখন মাসে মাসে হেডমাস্টার বদল করুন অথবা ৬ মাস হেড্‌মাস্টার না রাখিয়া স্কুল চালান আর কারও কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই। আবার এইরূপ কোনো কোনো হেড্‌মাস্টারও এবারকার পরীক্ষকদের আশীর্বাদে আপন আপন গদিতে গট্ হইয়া বসিলেন, আর তাঁদের নাড়ে কে ? হয়ত কাহার একটি ছাত্রও পূর্ব বৎসরে পাস হয় নাই, ও এ বৎসর আবার সেরূপ হইলে তাহাকে বিদায় লইতে হইত ; কিন্তু সে ভয় কাটিয়া গেল। আর বৎসর যেমন একজনও পাস হয় নাই, এ বৎসর হয়ত দুই জন দ্বিতীয় বিভাগে ও এক জন তৃতীয় বিভাগে পাস হইয়া স্কুলের মুখ উজ্জ্বল, গ্রামের নাম রক্ষা ও মাস্টারের অভাবপক্ষে এক বৎসরের বালামের কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়াছে।

অতএব এ দেশের পক্ষে এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বড় কম কথা নয়। এক পাস ফেলের উপর কত নির্ভর করে, তাহা দেখ। এক জন বালক পাস হইলে তাহার তো উপকার আছেই, কিন্তু তৎসঙ্গে তাহার শিক্ষকের, বিদ্যালয়ের এবং গ্রামেরও উপকার হইয়া থাকে। কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যদি এই পরীক্ষায় ক্রমান্বয়ে কৃতকার্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার উন্নতি হইবে, এবং তদ্বিপরীত অবস্থায় উহা একেবারে নষ্ট হইবে। কত এন্ট্রেন্স স্কুল উঠিয়া গিয়াছে, আবার মাইনর স্কুলের অবস্থায় অবনত হইয়াছে ; তাহার কারণ আর কিছুই নয় কেবল এই, যে অনেক দিন ধরিয়া তথা হইতে কেহ এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই।

এক্ষণে আইস, আমরা বিবেচনা করি, এই যে এত ছাত্র এ বৎসর পাস হইয়াছেন ; ইঁহারা কি করিবেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কলেজে ভর্তি হইয়া উচ্চতম ভাষা বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে প্রবৃত্ত হইবে, কেহ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করিবেন, কাহার বা চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা থাকাতে Campbell বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তিন বৎসর কাটাইতে হইবে। যাঁহাদের পয়সা আছে তাঁহারাই উপরোক্ত রূপে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা পাস হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেরই অবস্থা তত ভালো না হইতে পারে। এবং সেই জন্য ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং, ইংরাজি ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার উপযোগী কলেজ পল্লীগ্রামে না থাকাতে কলিকাতায় বা অন্য কোনো নগরে গিয়া ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব।

আহা এ অবস্থায় কত উচ্চাভিলাষী যুবককে আপনার মনের ইচ্ছা মনেই দমন রাখিয়া সামান্য চাকরির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হইবে। যাহাদের


www.pathagar.com

ভাগ্য ভালো তাহারা কত যত্নে হয় কোনো আফিসে সামান্য বেতনের চাকরি না হয় কোনো পল্লীগ্রামস্থ স্কুলে নিম্ন শ্রেণীস্থ শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইবেন। অবশিষ্ট যাঁহারা তাঁহাদের ঘরে বসিয়া কালাতিপাত করিতে হইবে, বড় জোর না হয় কোনো আফিসে এপ্রেন্টিস থাকিয়া কবে কার্য হইবে এই আশায় "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হবে।" আবার খোরাক জুটাইবার জন্য দুই এক টাকা মাসিক বেতনে প্রাইভেট্ টুইসন (Private Tuition) দিয়া বেড়াইতে হইবে।"

প্রথম বাংলা শিক্ষা পত্রিকা 'ছাত্রমিত্র' উনিশ শতকের এমন এক সময়ে প্রকাশিত যখন শিক্ষা বা ইংরেজি শিক্ষার বিষয়টি ঔপনিবেশিকতার সূত্রে ভারতবর্ষে বিপুল বিস্তৃতি লাভ করেছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানীয় ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার পঠন-পাঠন পেয়ে গেছে সামাজিক স্বীকৃতি। ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী প্রভাবশালী স্থিতিতে বিকাশমান। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসসহ নানাবিধ প্রতিষ্ঠান শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকতাকে ইতিবাচক বলে প্রমাণ করে। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। লক্ষ করার বিষয় প্রথম বাংলা শিক্ষা পত্রিকা প্রকাশিত হয় বিদেশীদের সম্পাদনায় ও পৃষ্ঠপোষণায় একটি মিশনারি স্কুল থেকে। ৩৩, এ্যামহার্স্ট স্ট্রিট কলকাতায় অবস্থিত চার্চ মিশনারি সোসাইটি বয়েজ বোর্ডিং স্কুল (সংক্ষেপে সি. এম. এস. বয়েজ বোর্ডিং স্কুল) থেকে প্রকাশিত ও ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত পত্রিকাটি সামগ্রিকভাবে একটি সুপরিকল্পিত চিন্তার ফসল। প্রথম শিক্ষা পত্রিকা বিদেশীর পরিবর্তে স্থানীয়দের সম্পাদনায় বেরোলে কেমন হত, তা বলা দুরূহ হলেও এটুকু বলা যায় যে তা ভিন্নরকম হত। 'ছাত্রমিত্র' স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী শিক্ষা পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। পত্রিকাটির রচনাবলির ভাষা ও বর্ণনভঙ্গিও বিষয়ানুগ এবং ক্ষেত্র বিশেষে উপভোগ্য।

১৮১৮-তে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা থেকে ১৮৮২-র ব্রিটিশ সরকার প্রকাশিত দ্বিতীয় শিক্ষাভাষ্য পর্যন্ত পঁয়ষট্টি বছর ভারতবর্ষে বিশেষত সমগ্র বাংলায় শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ আকাঙ্ক্ষিত রূপরেখা অনুসারে। ১৮৩৫-এ ম্যাকলে যে শিক্ষা নীতির প্রস্তাবনা রাখেন পরবর্তীতে সে ধারাই অনুসৃত হয়েছে নানা প্রকারে। এখানে অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারি-অমিশনারি দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটটিও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমাবধি বাংলায় মিশনারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সমান্তরালে ধর্মচর্চা ও ধর্মপ্রচারের বিষয় গুরুত্ব পায়। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের সমন্বয়কে মিশনারিরা বিশেষ ব্রত হিসেবেই নেয়। ১৮৫৪-র প্রথম শিক্ষাভাষ্যে ব্রিটিশ সরকার তাদের শিক্ষাপরিকল্পনাকে নিরপেক্ষ তথা ধর্মের বাধ্যবাধকতামুক্ত বলে ঘোষণা করলে মিশনারিরা এতে বেশ ক্ষুব্ধ হয় এবং তারা বিভিন্ন সময়ে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আলেক্সান্ডার ডাফ প্রমুখ


www.pathagar.com

মিশনারিপন্থীরা ব্রিটিশ শিক্ষাকে 'অখ্রিষ্টান' বলে অভিযুক্ত করে এবং স্কুল-কলেজে অনুসৃত পুস্তকসমূহকে নৈতিকতাপূর্ণ ও শিক্ষামুখী নয় বলে বিষোদ্গার করেন তাঁরা। এভাবেই মিশনারি ও অমিশনারি দুটি সমান্তরাল ধারায় বিকশিত হয় বাংলার শিক্ষা। 'ছাত্রমিত্র' পত্রিকাটি গোড়া থেকে নিজেকে নিরপেক্ষ বলে দাবি করলেও এটিতে মিশনারি ধারার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১৮১৭-র ২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত (কলকাতায় ১৮২৩-এ) চার্চ মিশনারি সোসাইটি মূলত তিনটি উপায়ে তাদের কর্মধারাকে চালিত করে—বিদ্যালয়, ধর্মগ্রন্থ ও ধর্ম বিষয়ক প্রচারণা এবং মিশনারি প্রতিষ্ঠান। আগ্রা, মিরাট, চুনার, বর্ধমান, খিদিরপুর প্রভৃতি এলাকায় গড়ে উঠতে থাকে তাদের কেন্দ্রগুলো। চার্লস্ লুসিংটন-এর গ্রন্থ থেকে ('দ্য হিস্ট্রি, ডিজাইন এ্যান্ড প্রেজেন্ট স্টেট অব দ্য রিলিজিয়াস, বেনেভোলেন্ট এ্যান্ড চ্যারিটেবল ইন্সটিটিউশন বাই দ্য ব্রিটিশ ইন ক্যালকাটা এ্যান্ড ইটস্ ভিসিনিটি,' ১৮২৪) জানা যায় যে যিশুখ্রিষ্টের পবিত্র বার্তার প্রচারণাই তাদের আসল কাজ। তারা মনে করত এর মাধ্যমে তারা স্থানীয়দের সত্যের জগতে নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে অন্ধকার থেকে আলোয়, শয়তানের হাত থেকে ঈশ্বরের আশ্রয়ে। এই গুরুদায়িত্ব পালনে মিশনারিরা স্থানীয়দের সঙ্গে মিশেছে, স্থানীয় রীতিনীতি জানবার চেষ্টা করেছে, প্রয়োজনে দেশীয় ভাষা শিখে দেশীয়দের মধ্যে কাজ করেছে নানাভাবে। ১৮৬৪ সনে প্রকাশিত জন মারডকের গ্রন্থ 'ইন্ডিয়ান মিশনারি ম্যানুয়েল : হিন্টস্ টু ইয়াং মিশনারিজ ইন ইন্ডিয়া' থেকে দেখা যাচ্ছে মিশনারিদের প্রতি কর্তৃপক্ষের নির্দেশই ছিল স্থানীয়দের ভাষা-সংস্কৃতি-আচারকে সম্মান করার। বলা হয়েছে যাদের মধ্যে তারা কাজ করতে চায় তাদের জীবনাচরণকে অধ্যয়ন করতে হবে। তাদের সঙ্গে মিশতে হবে আন্তরিকভাবে, তাদের জাতীয় বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে। এতে করে স্থানীয়রা ভাববে যে মিশনারিরা তাদের আসলে নিঃস্বার্থভাবে সহায়তা দিতেই এসেছে। 'ছাত্রমিত্র' পত্রিকার পরিচর্যায় উপর্যুক্ত মিশনারি অধ্যবসায়ের ছাপ রয়েছে।

'ছাত্রমিত্র' পত্রিকাটির সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৮ সনে প্রথম প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। 'দিগ্‌দর্শন' যুবকদের জন্যে প্রকাশিত পত্রিকা। ফলে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-তথ্য-বিজ্ঞান-ইতিহাস প্রভৃতির নির্বাচিত সংকলন হয়ে ওঠে দ্বিভাষিক পত্রিকাটি। কিন্তু শিক্ষার প্রায়োগিকও বিরাজমান অবস্থার চিত্র সেভাবে দিগ্‌দর্শনে স্থান পায়নি। সেটার মূল কারণ হল উনিশ শতকের প্রথম দুই দশক ছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক কাল এবং সরকারি ভাষা তখনও ফারসি। ১৮৯২-তে ইংরেজি শিক্ষা এর একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ স্তর অতিক্রম করবার পথে। এরি মধ্যে ১৮৫৪ ও ১৮৮২-তে দুটি সরকারি শিক্ষাভাষ্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। 'দিগ্‌দর্শন' মিশন থেকে প্রকাশিত পত্রিকা হলেও তাতে ধর্মসংক্রান্ত প্রচারণা বা সুযোগমতো যিশুর মহিমাকীর্তনের দিকটিও চোখে


www.pathagar.com

পড়ে না। যেটা 'ছাত্রমিত্র'-এ সহজেই চোখে পড়ে। 'ছাত্রমিত্র'র পুঁজিও ছিল অবশ্য অনেক বড়ো। চার্চ মিশনারি সোসাইটির ভারতবর্ষব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রচারণা এবং বিশ্বব্যাপী এর বিস্তারের প্রভাব তাদেরকে করে তোলে আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন। তাই 'ছাত্রমিত্র'র বিভিন্ন রচনায় এমনকি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়ও ঈশ্বরের অবতারণা। এটিও মনে রাখা দরকার ঈশ্বর সংশ্লিষ্টতার ভূমিকা দ্বারা মিশনারিরা নিজেদের সরকারি শিক্ষানীতি থেকে পৃথকভাবে প্রকাশে তৎপর থাকে। ১৮৯২-র সেপ্টেম্বরে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর এর আরাধ্য সম্পর্কে পাঠকপক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্ন অমূলক নয়। কেননা মিশনারি সোসাইটির শিক্ষাপত্রিকা কতটা নিরপেক্ষ হবে সে প্রশ্ন স্থানীয়দের মধ্যে জাগে তাদের ধর্মপ্রচারণার ভূমিকার কারণে।

চার্চ মিশনারি সোসাইটির পৃষ্ঠপোষণায় এবং বিদেশী কর্তৃক প্রকাশিত হলেও 'ছাত্রমিত্র' প্রকৃতপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-পত্রিকার চরিত্র অর্জন করতে সক্ষম হয়। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত রচনাবলি-ই তার প্রমাণ। রচনারীতির বিচারে কিংবা ভাষা ও গদ্যভঙ্গির দিক থেকেও সেগুলো মান ও প্রসাদ গুণসম্পন্ন। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেও রচনাগুলো সফল। কবিতানুবাদ ও উপন্যাস প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'ছাত্রমিত্র' পঠনপাঠন ও সুস্থ মনন প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করেছে যা প্রশংসনীয়। সম্ভবত এ ধরনের কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজনও প্রথম করে 'ছাত্রমিত্র'-ই। সামগ্রিক বিচারে, ১৮৯২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত বাংলা শিক্ষা-পত্রিকা 'ছাত্রমিত্র'র ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষার প্রায় এক শতাব্দীকালের উত্তরাধিকারের আলোকে এটির মূল্যায়ন প্রাসঙ্গিক। পরবর্তীকালে শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হলেও এ ধারার প্রথম প্রকাশনা হিসেবে 'ছাত্রমিত্র' ন্যায্য গৌরবের দাবিদার।


www.pathagar.com

# জেমস ড্রমন্ড এন্ডার্সন ও তাঁর কর্ম : একটি মূল্যায়ন

## ১.১

জেমস ড্রমন্ড এন্ডার্সন, সংক্ষেপে জে. ডি এন্ডার্সন (১৮৫২-১৯২০) আজ থেকে সাতাশি বছর আগে মৃত্যুবরণ করেন। বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির একনিষ্ঠ ভক্ত এই ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর জীবন ও সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে কোনো যথার্থ মূল্যায়ন অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি। অথচ, একজন বিদেশী হয়েও তিনি অত্যন্ত মমতাভরে বাংলা ভাষা শেখেন, বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজীবন-সংস্কৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন, যেসব গ্রন্থ প্রায় শত বছর পূর্বেকার সমাজ-জীবন-লোকাচার সম্পর্কিত মূল্যবান দলিলরূপে বিবেচিত। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিদর্শনসমূহ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে সেক্ষেত্রে তিনি অর্জন করেন পথিকৃতের ভূমিকা। চট্টগ্রামের প্রবাদবিষয়ক প্রথম গ্রন্থটির সংগ্রাহক এবং রচয়িতাও তিনিই। জে. ডি এন্ডার্সন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন এবং বাংলার তৎকালীন সাহিত্যিক-বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

তাঁর জীবনী সম্পর্কে জানা যায় তিনটি উৎস থেকে। প্রথমটি ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ বায়োগ্রাফিক্যাল হিস্ট্রি অব গন্‌ভিল এ্যান্ড কী'জ কলেজ[১]। এ গ্রন্থ থেকে জানা যায় তাঁর পুরো নাম জেম্‌স ড্রমন্ড এন্ডার্সন, জন্ম ১৮৫২ সালের ১১ নভেম্বর। পিতা জেম্‌স্ এন্ডার্সন ছিলেন বাংলা অঞ্চলের হাসপাতালসমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল ; মাতার নাম এলেন গার্স্টেন। তাঁর অধ্যয়নপর্ব সমাপ্ত হয় ইংল্যান্ডে। ১৮৬২-১৮৬৬ চেতেনহ্যাম কলেজ, ১৮৬৭-১৮৭২ রাগবি স্কুল—এই দুটি প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শেষ করে তিনি ১৮৭৫-এ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে কর্মজীবন শুরু করেন বাংলা অঞ্চলে সরকারি পদে যোগদানের মাধ্যমে। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কাটে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। ১৯০০ সনে চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পদে


www.pathagar.com

কর্মরত থাকা অবস্থায় তাঁর চাকরি জীবনের অবসান ঘটে। ১৯০৭ সন থেকে বেশ কয়েক বছর তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস স্টাডিজ বোর্ড-এর বাংলা বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন। ১৯০৯ সনে ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক এম. এ ডিগ্রি প্রদান করে। তিনি লুসাই, ত্রিপুরা, দেউড়ি ছুটিয়া এবং আকা প্রকৃতি ভাষার শব্দ সংগ্রহের এবং কাছাড়ি গল্পের সংকলন সম্পাদনা করেন। একই গ্রন্থের ১৯৪৮-এর সংস্করণে[২] এন্ডার্সনের জীবন সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৯১৯ সনে তিনি ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে লিট. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায়, তিনি আসামের সহকারী কমিশনার ছিলেন। এছাড়া স্থানীয় সরকারের সহকারী সচিব, ডেপুটি কমিশনার, স্কুল পরিদর্শক এবং পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন সেখানে। ১৮৯৪-তে তিনি আসাম থেকে পুনরায় বাংলায় চলে আসেন। ১৯১৯ সনে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন এন্ডার্সন। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন বহু বছর। অধ্যাপনা করেন লন্ডনের ওরিয়েন্টাল স্কুলে। গ্রন্থটিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য যেসব বইয়ের নাম রয়েছে সেগুলো হচ্ছে—রেভারেন্ড এস এনডেল রচিত *দ্য কাছাড়িজ* গ্রন্থের ভূমিকা, *এ ম্যানুয়েল অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ, লে ভোয়া দ্যু ভের্ব বেংগলি* (ফরাসিতে), *দ্য পিপল অব ইন্ডিয়া* এবং *ফনেটিক্স অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ*। ১৯২০ সনের ২৫ নভেম্বর জে. ডি এন্ডার্সন মৃত্যুবরণ করেন। তৃতীয়টি একটি পুস্তিকা—*ইন মেমোরিয়াম : জেমস ড্রমন্ড এন্ডার্সন লিট. ডি*[৩] ; রচয়িতা এইচ টি ফ্রান্সিস, এম. এই—নি গন্‌ভিল এ্যান্ড কী'জ কলেজের ফেলো এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির উপ-গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ফ্রান্সিসের রচনায় এন্ডার্সন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন রয়েছে। বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সনের একটি চিঠির গ্রন্থস্থিত উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, এন্ডার্সন ছিলেন গ্রিয়ার্সনের বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গ্রিয়ার্সন জানান যে নিজের ব্রিটিশ সত্তা বজায় রেখেও ভারতীয় সংস্কৃতিকে উদার চিত্তে গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে এন্ডার্সন ছিলেন এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। এর ফলে বাঙালিরাও তাঁর প্রতি দেখিয়েছে ভালোবাসা। এমনকি যাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানে এন্ডার্সন তেমন আস্থাশীল ছিলেন না তাঁরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করে গেছেন। ভারতবাসী অধিকাংশ ব্রিটিশ যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো সম্পর্কে বলতে গেলে অজ্ঞই ছিল সেখানে এন্ডার্সন সেগুলোকে গ্রহণ করেছিলেন ঔদার্যভরে। গ্রিয়ার্সন আরো জানান, বাংলার মতো একটি কঠিন ভাষায় খুব অল্প লোকেই দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। কিন্তু এন্ডার্সন বাংলা ভাষায় প্রভূত পারদর্শিতার স্বাক্ষর রাখেন।

ফ্রান্সিসের রচনা থেকে জে ডি এন্ডার্সন সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। যেমন তিনি বাংলা ছাড়াও ফরাসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন—ফরাসিতে


www.pathagar.com

বক্তৃতা দিতে পারতেন অনর্গলভাবে। ছাত্রজীবনে এক পর্যায়ে এন্ডার্সন প্যারিসে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ফ্রান্সে দীর্ঘকালীন বসবাসের প্রতি অনীহার কারণে সে আশা ছেড়ে দিতে হয়। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর নেবার পর পাকাপাকিভাবে কেম্ব্রিজে চলে আসেন তিনি। ১৯০৭ সনে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন।[৪] যুদ্ধের বছরগুলোতে তাঁর ব্যস্ততা বেড়ে যায়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত লন্ডন ওরিয়েন্টাল স্কুলে বক্তৃতা দেয়া ছাড়াও আরো এক কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয় তাঁকে। সেটি হল বাংলা ভাষায় রচিত অসংখ্য চিঠিপত্রের দুর্বোধ্য পাঠ উদ্ধার এবং সেগুলোর আপত্তিকর অংশসমূহ শনাক্ত করা। এসব চিঠিপত্রের অনেকগুলোই ছিল জাহাজের লস্করদের লেখা, যেগুলো জাহাজে প্রচলিত বিশেষ ধরনের ভাষায় পরিপূর্ণ। চিঠিপত্রগুলোতে রচয়িতাদের কাজকর্ম এবং তাদের পরিবার সংক্রান্ত নানা বিষয় প্রাধান্য পেত। এন্ডার্সন পরবর্তীতে প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন যে গোটা যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশ জাহাজে কর্তব্য পালনরত এসব লস্কর তাদের বিশ্বস্তভাবে দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিটুকুও পায়নি। হয়ত বা যৎসামান্য ক্ষতিপূরণই জুটেছিল তাদের ভাগ্যে। সম্ভবত, এই দায়িত্বের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্টতা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির চাপ ইত্যাদি মিলিয়ে এন্ডার্সনের অকাল অসুস্থতা ও মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। ফ্রান্সিসের রচনায় এন্ডার্সনের চারিত্রিক সজ্জনতা, ঔদার্য, দয়া, সহানুভূতিশীলতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া এন্ডার্সনের সাহিত্যিক তৎপরতার নিদর্শনস্বরূপ বলা যায় লন্ডনের *দ্য টাইম্‌স্* পত্রিকায় নিয়মিত রচনার কথা। বিখ্যাত *স্পেকটেটর* পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হত জে. ডি. এ লেখক নামে।

## ১.২

জে ডি এন্ডার্সনের সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে তাঁর উদার হৃদয় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এবং বৃহৎ অর্থে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। এটা সত্য, ব্রিটিশ সিভিলিয়নদের অনেকেই ভারতবর্ষের প্রতি তাঁদের অনুরাগের স্বাক্ষর তাঁদের কর্মে রেখে গেছেন। এন্ডার্সনের কাজের ব্যতিক্রমধর্মিতা এখানেই যে ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত থেকেও কেবলমাত্র ভালোবাসা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা তিনি বাংলা ভাষা-সাহিত্য এবং এখানকার সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মসমূহ সম্পাদন করে গেছেন। বাংলা ও বাঙালির প্রতি তাঁর আকর্ষণ শুধু গ্রন্থ রচনা কিংবা অনুবাদেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর অন্যতর মাত্রাও দেখতে পাই। সমকালীন সাহিত্যমণ্ডল এবং বাঙালি বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সেই সত্যের পরিচায়ক। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৬


www.pathagar.com

জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির-এর সহযোগী সম্পাদক শ্রী ব্যোমকেশ মুস্তফী স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পাঠানো হয় তৎকালে কেম্ব্রিজবাসী জে ডি এন্ডার্সনের নিকটে। এই চিঠি থেকে সমকালীন বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গুরুত্বের পাশাপাশি পত্র প্রাপকের ভূমিকা ও অবদানও অনুধাবনযোগ্য। ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানা সংবলিত চিঠিটি—

*"মান্যবর শ্রীযুক্ত J. D. Anderson মহাশয় সমীপেষু,—যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন, —*

*বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গত ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৬শ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সমর্থনে আপনি সাহিত্য-পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এ নির্ব্বাচন অঙ্গীকার করিলে বাধিত হইব। পরিষৎ নিয়মাবলী পাঠাইলাম।*

*সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবীদিগের সর্ব্বপ্রধান সম্মিলন-ক্ষেত্র। উহার মাসিক অধিবেশনে বিবিধ তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হয় ও সাহিত্য ও ইতিহাসাদির সম্পর্কে নবাবিষ্কৃত তথ্যসকল বিজ্ঞাপিত হয়।*

*সভ্যগণের দেয় প্রবেশিকা ১ (এক) টাকা ও মাসিক চাঁদা (অন্যূন) ।৷৹ (আট) আনা মাত্র। আশা করি, কর্ম্মের গৌরব বিবেচনায় মহাশয় এই মুষ্টিভিক্ষাদানে কুণ্ঠিত হইবেন না। এই পত্রে সংলগ্ন অপর পত্রখানির শূন্য স্থানগুলি পূরণ করিয়া প্রবেশিকা ১ (এক) টাকা পাঠাইলেই মহাশয়ের নাম সভ্যতালিকাভুক্ত হইবে ও মহাশয়ের নিকট যথাসময়ে পুস্তকপত্রাদি প্রেরিত হইবে।*

*আশা করি, অবিলম্বে প্রবেশিকাসহ আপনার সভ্যপদ-স্বীকার পত্র প্রাপ্ত হইব।*

*বশংবদ*
*শ্রী ব্যোমকেশ মুস্তফী*
*সহ-সম্পাদক"*

উপর্যুক্ত চিঠি থেকে স্পষ্ট, এন্ডার্সনের তরফ থেকে নয় বরং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদই তাঁকে সদস্য করে নেয়াতে আগ্রহী। এন্ডার্সনের পক্ষে আরো আগে তাঁর বাংলায় প্রবাসজীবন কাটানো অবস্থাতেই সভ্য হওয়াটা সহজতর হত। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। বাংলা ভাষাসাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জি. ডি এন্ডার্সনের গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এ মনোনয়ন। একই সঙ্গে ব্যোমকেশ মুস্তফীর পত্রোল্লিখিত প্রস্তাবক ও সমর্থক ব্যক্তিদ্বয়ের প্রসঙ্গটিও স্মর্তব্য। প্রস্তাবক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ এবং স্বনামধন্য ঐতিহাসিক। সমর্থক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এবং পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রস্তাবটি সাদরে


www.pathagar.com

গ্রহণ করেন এন্ডার্সন। পরবর্তী বছরে, ১৩১৮ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ৬২-সংখ্যক পৃষ্ঠায় "মফস্বল" বিভাগের সভ্যদের তালিকায় ৮৮ সংখ্যক সদস্য হিসেবে জে ডি এন্ডার্সনের নাম মুদ্রিত হয়। পরিচিতিসহ তাঁর কেম্ব্রিজস্থ ঠিকানাও ছাপা হয়—"শ্রী জে. ডি এন্ডারসন, এম. এ, আই.সি.এস মস্টিন হাউজ, ক্রুকল্যান্ডস্ এভিনিউ, কেম্ব্রিজ, ইংল্যান্ড।" এন্ডার্সনকে কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য বললে ভুল হবে, বলা চলে তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিদেশী দূতস্বরূপ। পরিষদের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে নিজস্ব উদ্যোগে বিদেশে প্রচারের ব্যবস্থা করেন তিনি। ১৩১৩-১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার চতুর্দশ ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত পরিষদ সচিব রাজা যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর একটি পত্র (১৯ মে ১৯১৩) থেকে দেখা যাচ্ছে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল-এ জে. ডি এন্ডার্সনের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়, যেটির বিষয়বস্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মোদ্যোগ ও ভূমিকা। উক্ত পত্র থেকে এও জানা যায় যে সাহিত্য পরিষদের বিশ্বাস এন্ডার্সন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্তাকে ইয়োরোপ আমেরিকার বিদ্বৎসমাজের নিকটে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

## ১.৩

ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলা অঞ্চলে বসবাসকালে জে. ডি এন্ডার্সন তাঁর সৃষ্টিতে বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতির জগৎকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। বাংলায় বসবাসকালে তো বটেই ইংল্যান্ডে থেকেও বাঙালির মননশীল কর্মকাণ্ড এবং বাংলার বিদ্বৎসমাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যমহলও তাঁকে গ্রহণ করে সাদরে। বাংলা ও বাঙালির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এমনকি তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরেও অব্যাহত ছিল। ১৯১৭ সনের ৬ এপ্রিল চট্টগ্রামের রাঙামাটি থেকে পাঠানো গবেষক-ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র ঘোষের একটি পত্র থেকে দেখা যায় শ্রী ঘোষ তাঁর *চট্টগ্রামের বিরবণী* গ্রন্থের ২য় খণ্ড পাঠান ইংল্যান্ডবাসী এন্ডার্সনের নিকটে[৫]। ইতিপূর্বে তাঁকে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রেরণের তথ্যও জানা যায় উক্ত পত্র থেকে। পত্রপ্রেরক তাঁর পত্রে এন্ডার্সনের কাছ থেকে গ্রন্থদ্বয়ের ব্যাপারে "মূল্যবান মতামত" প্রত্যাশা করেন। সতীশচন্দ্র ঘোষের এ চিঠি থেকে আরো জানা যায় জে ডি এন্ডার্সনের সুপারিশেই রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে "একজন অনাবাসিক সদস্য" নির্বাচিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে জে ডি এন্ডার্সনের যোগাযোগ এবং ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ছিল। সম্ভবত কর্মজীবনে বাংলায় বসবাসকালে তাঁদের পারস্পরিক পরিচয়ের সূত্রপাত। এন্ডার্সন রচিত *এ ম্যানুয়েল অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ*[৬]-এ তিনি বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্যের


www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠি অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৩২০ সালের ৬ ফাল্গুন লেখা এ চিঠিতে[৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে চিঠির প্রাথমিক অংশের উদ্ধৃতি দেয়া গেল—

*"প্রিয়বরেষু,*

*আপনি যখন আমাকে ইংরেজিতে পত্র লেখেন, তখন আমার কর্তব্য আপনাকে বাংলা ভাষায় তাহার উত্তর দেওয়া, নহিলে ঠিক পাল্টা জবাব হয় না। আপনার দেশে আমার যত বন্ধু আছেন সকলকেই আমার ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখিতে হয়। ভাগ্যগুণে একটি লোক পাইয়াছি যাঁহার কাছে আমার আপন ভাষায় মনের কথা খুলিয়া বলিবার কোন বাধা নাই। এমন সুযোগ বৃথা নষ্ট করিব কেন ? ইংরেজি ভাষার কাছে পদে পদে আমি যে কত অপরাধ করিয়া থাকি, তাহার আর সংখ্যা নাই ; কলমের মুখে আপনাদের ব্যাকরণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিই, কত অব্যয়ের অন্যায় অপব্যয় করি, কত article-কে বিনাদোষে বর্জন করি এবং বিনা কারণে গ্রহণ করিয়া থাকি। এ সত্ত্বেও আপনাদের ইংরেজি ভাষা সরস্বতী তাঁহার এই অধর্ম সেবকটিকে যে এত দয়া করিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভূজা ভারতীকে যখন আমার কাব্যপুষ্প দিয়া পূজা করিয়াছি, তখন তাহা আমি আমার সাধ্যমতো যত্নপূর্বক চয়ন করিয়াছি এবং তাঁহার প্রসাদও পাইয়াছি কিন্তু আমার এই শুষ্ক পত্রগুলো যখন তাঁহার গায়ে গিয়া পড়ে তখন স্পষ্টই দেখিতে পাই তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। অতএব যেখানে সম্ভব সেখানে এ অপরাধ আর বাড়াইব না, পত্র আপনাকে বাংলাতেই লিখিব।*

*ছন্দ সম্বন্ধে আপনি যে আলোচনা করিতেছেন, আমি বড়ো আনন্দ পাইয়াছি। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন বাঙ্গালী কোন কথা কহে নাই। আমার ইচ্ছা ছিল কিছু লিখিব, কিন্তু আমার কলম অলস হইয়া আসিয়াছে, এখন সে আর নিজের বেগে চলে না, তাহাকে ঠেলিয়া চালাইতে হয়। মোটর গাড়ির কল যখন বিকল হয়, তখন তাহাকে ঠেলা গাড়ি করা সহজ নহে, তখন তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়াই ভাল।"*

উপর্যুক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগবৈদগ্ধ্যের চমৎকার নিদর্শন উৎকীর্ণ। পাশাপাশি পত্র যাঁকে লেখা হচ্ছে তাঁর মর্যাদাকর সাহিত্যিক অবস্থানের চিত্রটিও পাওয়া যাচ্ছে। তৎকালীন বাংলার বিদ্বৎমহলে জে. ডি এন্ডার্সনের বিশিষ্ট পরিচিতির দিকটি এখানে ধরা পড়ে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরেও তাঁর সেই পরিচিতি ম্লান হয়নি। ১৯১৮ সনে তাঁর ইংল্যান্ডে বসবাসকালে প্রকাশিত হয় তাঁর অনুবাদগ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *ইন্দিরা এ্যান্ড আদার স্টোরিজ*। বাংলার তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লেখা তাঁর এবং তাঁকে লেখা অন্যদের চিঠিপত্র আবিষ্কৃত হলে এ বিষয়ে নতুন আলোকপাত ঘটা সম্ভব।


www.pathagar.com

জে ডি এন্ডার্সনের সমগ্র কর্মকে প্রধানত তিনটি শাখায় ভাগ করা যায়—ভাষা বিষয়ক, সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক এবং অনুবাদ। এটি এ যাবৎকালে প্রাপ্ত তাঁর ছয়টি গ্রন্থ ও একটি পুস্তিকার ভিত্তিতে কৃত। তাঁর গ্রন্থসমূহ অধুনা দুষ্প্রাপ্য। বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখকৃত গ্রন্থসমূহ ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

ভাষা বিষয়ক গ্রন্থের প্রথমেই রয়েছে *এ শর্ট লিস্ট অব ওয়ার্ডস্ অব দ্য হিল টিপেরা ল্যাংগুয়েজ উইথ দেয়ার ইংলিশ ইকুইভ্যালেন্টস্* গ্রন্থটি। এটির প্রকাশকাল ১৮৮৫ সন, প্রকাশক শিলং-এর আসাম সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ১৮৮৩-৮৪ সনের শীতকালে সিলেটের উত্তরাঞ্চলে উপ-বিভাগীয় অফিসার পদে কর্মরত থাকাকালে এন্ডার্সন গ্রন্থটি সংগ্রহ-সম্পাদনার কাজ করেন। এ গ্রন্থে শ্রমনিষ্ঠা, মেধা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভূত পরিচয় রাখতে সক্ষম হন তিনি। এতে উক্ত অঞ্চলের জনজীবনের একটি সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলার অধ্যবসায় সুস্পষ্ট। সিলেট সীমান্তে বসবাসকারী তৎকালীন লুসাই জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষার শব্দও উৎকলিত হয়েছে গ্রন্থে। ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুযায়ী এন্ডার্সন অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাকেও বিচার করেছেন সমান্তরালে। পূর্বসূরি গবেষকদের কাজের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় সমাজ-ভাষা বিষয়ক গবেষণায় এন্ডার্সনের প্রস্তুতির ভিত্তিটি ছিল মজবুত। তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বে কৃত যে কাজগুলো তিনি গ্রহণ করেন সেগুলো হল—কোচ, বোড়ো ও ধীমল জাতিসত্তার বিষয়ে বিশ্লেষণ (১৮৪৭) ; রেভারেন্ড এন্ডেল-এর কাছাড়ি ব্যাকরণ (১৮৮৪) এবং চট্টগ্রামের সীমান্ত-অঞ্চলে বসবাসকারী লুসাইদের বিষয়ে ক্যাপ্টেন লুইসের লুসাই ভাষা সংক্রান্ত বিশ্লেষণ। গবেষণাটি ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের ভাষার শব্দ নিয়ে হলেও একই সঙ্গে লুসাই ও বোড়ো ভাষার তুলনামূলক দৃষ্টান্ত তাঁর গ্রন্থের গুরুত্বকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। যে যে বিষয় তাঁর গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে, সেগুলো হল—সাধারণ শব্দাবলি, শরীর, খাদ্য-বস্ত্র, বন্যপ্রাণী, পাখি, শাক-সব্জি, গার্হস্থ্য জিনিসপত্র, প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্বন্ধ, বিমূর্ত বিষয় (যেমন : বয়স, জন্ম, মৃত্যু, নাম), সময়বাচক, বিশেষণ, সংখ্যা ইত্যাদি। সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরার পার্বত্য জীবনের একটি আয়াত রূপ তুলে ধরার চেষ্টা গ্রন্থটিতে পরিস্ফুট। এন্ডার্সনের পূর্বে জি ক্যাম্পবেল (১৮৭৪) এবং পরে সি এ সপিট (১৮৮৫), জে এফ নীডহ্যাম (১৮৮৬) এবং এ জে প্রিমরোজ-কৃত গবেষণাসমূহ উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবন সমাজ ভাষা বিষয়ে যে আলোকসম্পাত ঘটায় বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী আদিবাসী সংরক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে তা ঐতিহাসিক সামাজিক-নৃতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্ববহ।


www.pathagar.com

বাংলা ভাষার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ নিয়ে জে ডি এন্ডার্সনের প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফল *ফনেটিক্স অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ* পুস্তিকা। ছয় পৃষ্ঠার এ পুস্তিকা প্রথমে প্রকাশিত হয় লন্ডনস্থ স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এর বুলেটিনে প্রবন্ধরূপে। একই বছরে (১৯১৭) বেরোয় এর মলাটবদ্ধ সংস্করণ। এতে বাংলা বর্ণমালার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত। বস্তুত লন্ডনস্থ স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে পড়াতে গিয়ে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত গবেষণার দিকে ঝুঁকে পড়েন এন্ডার্সন। এটিও লক্ষণিয় তাঁর বাড়তি পুঁজি ছিল বাংলা অঞ্চলে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করবার বিপুল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তাঁর বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় তিনি বাংলা ভাষাকে একটি প্রণালিবদ্ধ আধুনিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন, যে ভাষার বিন্যাসগত শৃঙ্খলা পৃথিবীর যে কোনো উন্নত ভাষার সমান্তরালে বিচার্য। এন্ডার্সনের এতদ্বিষয়ক গবেষণার চূড়ান্ত রূপ তাঁর *এ ম্যানুয়েল অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ* নামক ১৭৮ পৃষ্ঠার (১৮ পৃষ্ঠার ভূমিকাসহ) গ্রন্থ। ১৯২০ সনে প্রকাশিত এ গ্রন্থ তাঁর রচিত সর্বশেষ গ্রন্থও বটে। এ বছরেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি। গ্রন্থটি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশী কর্তৃক বাংলা ভাষার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত গুটিকতক গ্রন্থের মধ্যে, বাংলা ভাষাতত্ত্বচর্চার ঊষাকালে এটি প্রথম কাতারে আসনের দাবিদার। সমগ্র গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অবাঙালি অথচ বাঙালিপ্রেমিক মানুষের মমতা। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় *'কেম্ব্রিজ গাইড্‌স্ টু মডার্ন ল্যাংগুয়েজেস্'* শ্রেণীর অন্যতম প্রকাশনারূপে। গ্রন্থকারের পরিচিতিতে তাঁকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থপ্রকাশকালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার শিক্ষক পদে কর্মরত।

জে ডি এন্ডার্সনের এ ম্যানুয়েল অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ গ্রন্থটিকে বলা যেতে পারে বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে গ্রন্থকার তাঁর বইয়ে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের এমন সব উপাদান জড়ো করেছেন যা একজন ইংরেজের পক্ষে বিস্ময়কর। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যময় রূপটিকে তিনি যথাসম্ভব তুলে ধরেছেন বিদেশী পাঠকের সামনে। একেবারে শুরুতেই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রটাই বিশেষ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। গ্রন্থোৎসর্গের তারিখ ইংরেজিতে নয় বাংলায় প্রদত্ত (ভাদ্র ১৩২৫) এবং বাংলা সেকালে শাসিতের ভাষা। এটাও লক্ষণীয় যে উৎসর্গপত্র আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালায় (আইপিএ) প্রতিবর্ণীকৃত বাংলা গদ্যে রচিত। "প্রিয় সুহৃদ শ্রী আলফ্রেড রেবেলিউ সুহৃদ্বরেষু"-কে উৎসর্গ করা জে ডি এ-এর উৎসর্গপত্রটি লক্ষ করা যাক : "আমাদের বীর পুত্রদ্বয়ে স্মরণ করিয়া, আমার চিরদিনের ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনার শ্রীকরকমলে প্রদত্ত করিলাম। এ ভয়ানক যুদ্ধের সময়ে আপনার সৌহার্দ্যটি আমার প্রধান সহায়তা হইয়াছে। আমার একান্ত কৃতজ্ঞতা ও


www.pathagar.com

ভালোবাসা গ্রহণ করিবেন। আপনার চির বন্ধু, জে ডি এ"। জেমস এন্ডার্সনের জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রেখে যান। উৎসর্গপত্রের ভাষা থেকে অনুমান করা সম্ভব তাঁর দুই পুত্র হয়ত বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রিটিশ বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। কিংবা তাঁরা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন।

*এ ম্যানুয়েল অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ* একটি সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত গ্রন্থ। এতে গ্রন্থকারের দীর্ঘকালীন ভাষা-সাহিত্যচর্চা ও অনুশীলন এবং ভাষা বিষয়ক শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা প্রভূত পরিমাণে উপকারি হয়েছে। গ্রন্থের সর্বত্র রচয়িতার সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত কোনো ব্যক্তিও উক্ত গ্রন্থের অনুসরণে এ ভাষা এবং এতে রচিত সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভে সক্ষম। গ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত (১) অথ্রগ্রাফি (বানানপদ্ধতি), (২) গ্রামার (ব্যাকরণ), (৩) স্পেসিম্যান্‌স্, (৪) লিটারেরি ট্রান্সলেশন্স অব দ্য এ্যাবাভ স্পেসিম্যান্‌স্ (উপর্যুক্ত নমুনাদির ভাষান্তর), (৫) দ্য বেঙ্গলি ক্যরেক্টর ইন প্রিন্ট এ্যান্ড রাইটিং (বাংলা লিপির মুদ্রিত ও লিখিত রূপ) এবং (৬) ভোক্যাবুল্যারি (শব্দ ভাণ্ডার)।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন গ্রন্থের ভূমিকার বিষয়বস্তু। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসখ্যাত লেখকদের সম্পর্কে একজন বিদেশী হয়েও তিনি যে বিশ্লেষণ করেছেন তা অসাধারণ এবং মৌলিক। তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ন থেকে কয়েকটি প্রসঙ্গ বিশ্লেষণযোগ্য। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে সংস্কৃত ভাষার শব্দের অস্বাভাবিক বিপলুত্বের কারণ সম্পর্কে এন্ডার্সনের ধারণা বাঙালিরা বহু প্রাচীনকাল থেকে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাফল্যের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও অনুশীলন করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগে বাঙালি রচয়িতাদের সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখ করেন। ঠিক যেমন উনিশ শতকের রোমক সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় অ-রোমক তথা স্প্যানিশ ও আফ্রিকীয় লেখকদের দ্বারা যাঁদের পূর্বপুরুষদের ভাষা রোমক ছিল না। এন্ডার্সন গীতগোবিন্দ ও এর রচয়িতা জয়দেবের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করেন এ প্রসঙ্গে। তাঁর ধারণা সংস্কৃত প্রভাবিত সাহিত্য বাংলা ভাষার বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও দেখবার বিষয়, তিনি বিদ্যাসাগরের রচনারীতির প্রশংসা করছেন এবং বঙ্কিমের সাহিত্য তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করছে। প্রসঙ্গত তিনি গ্রন্থের "নমুনা" অধ্যায়ে সংযোজিত (নেকড়ে বাঘ ও মেষ, কুকুরদষ্ট মনুষ্য, পথিকগণ ও বটবৃক্ষ, কুঠার ও জলদেবতা এবং বৃদ্ধ নারী ও চিকিৎসক প্রভৃতির অনুবাদ) বিদ্যাসাগরের গদ্যের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, একমাত্র সহজাত প্রতিভার গুণেই অত্যন্ত দক্ষতা ও সাবলীলতার সঙ্গে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতর


www.pathagar.com

মতো এমন কঠিন ভাষাকে উপস্থাপন করতে পারেন পাঠশালা পড়ুয়াদের নিকটেও।

জে ডি এন্ডার্সন যে বাংলা সাহিত্যের একজন অভিনিবিষ্ট পাঠক ছিলেন তাই নয়, সাহিত্য-সমালোচক হিসেবেও তিনি উচ্চাঙ্গের আসন দাবি করতে পারেন উক্ত সমালোচনার সূত্রে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন হল, দুই ধরনের রচনারীতিতে বঙ্কিমের পারঙ্গমতা দর্শনীয়। অতি পরিচিত ঘরোয়া হাটবাজারের প্রাকৃত বাগভঙ্গিনির্ভর রচনায় বঙ্কিমের কুশলতা ও সাহিত্যগুণ। নিরাভরণ করুণ রসনির্ভর কিংবা আটপৌরে কৌতুককর দৃশ্যকল্পনির্মাণে তাঁর অনির্বচনীয়তা। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, লোকজীবনের অধ্যয়নে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের সাফল্য এন্ডার্সন সঠিকভাবেই শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। আবার কটুকাটব্যপূর্ণ ও বিদ্রুপাত্মক ধারায় তাঁর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে এন্ডার্সন বঙ্কিমের ক্ষীণকায় অথচ "শক্তিমান ব্যঙ্গাত্মক রচনা" লোকরহস্যর দৃষ্টান্ত দেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের অবদানকেও উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেন এন্ডার্সন। প্রসঙ্গত শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেনের সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের প্রশংসা করে এন্ডার্সন জানান, মধ্যযুগের অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত বৈষ্ণব কবিদের রচনায় সংস্কৃতর প্রভাবমুক্ত বাংলা ভাষা অপূর্ব রূপশ্রীযুক্ত। এও তাঁর নজর এড়ায় না, সমকালীন এমন অনেক লেখক রয়েছেন যাঁরা সংস্কৃত ভাষার পুঁথিগত কাঠিন্য ও কৃত্রিমতার বিপরীতে বাংলা ভাষাকে অনেক সহজ ও অকৃত্রিম করে তুলেছেন—যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভূমিকার শেষাংশটুকু সংক্ষিপ্ত পরিসরের হলেও মূল্যবান। এতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। এন্ডার্সনের মতে এ সংগঠনের সদস্য হতে পেরে তিনি অত্যন্ত গর্বিত। বিশেষত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, তাঁর দৃষ্টিতে বাংলা ভাষাভাষী উৎসুক ছাত্রদের সংগঠন। বাংলা ভাষার জনমণ্ডলী, এন্ডার্সনের বিচারে ইন্দো-আর্য ভাষার আগমনের বহু আগেই স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্যবহারে শ্রীশালী। মগধ অঞ্চলের মানুষ উক্ত ভাষার আদি জনমণ্ডলী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণার প্রমাণ মেলে তাঁর আশাবাদ থেকে। এছাড়াও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়েই উভয় গোলার্ধ উপকৃত হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস। বিশেষ করে প্রাচ্যেও এমন বহু পণ্ডিত রয়েছেন যাঁদের সম্পদে সমৃদ্ধ হতে পারে পাশ্চাত্য। তিনি তাঁর দুই সুহৃদ ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বাংলা ভাষায় অভিধান প্রণেতা জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের কাজের প্রশংসা করেন। বস্তুত তাঁর উক্ত ভূমিকা থেকে এটা প্রতিভাত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা তাঁর কাছে ছিল ধ্যানের বিষয়। ভাষার রূপ-ধ্বনিগত বিশ্লেষণ এবং ভাষার সাহিত্যিক প্রকাশের


www.pathagar.com

সাফল্য বিচারকালে বাংলা ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা ও ঐশ্বর্যের কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর গ্রন্থ-ভূমিকাটি। এটিও লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা ভাষা সাহিত্যের আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সঙ্গে সংযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এন্ডার্সনের বাংলা ভাষাবিষয়ক গবেষণা বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেছে। কোনো বিদেশী কর্তৃক বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পথিকৃতের কৃতিত্বও হয়ত বা জে ডি এন্ডার্সনেরই।

গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা ভাষার ধ্বনি ও রূপগত বিশ্লেষণ এবং বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য-নমুনাদি স্থান পেয়েছে। বানান পদ্ধতির ক্ষেত্রে বর্ণ, শব্দ, শব্দের উৎস, উচ্চারণ ইত্যাদি এবং ব্যাকরণের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ, পুরুষ, কাল, ক্রিয়ার রূপ, বচন, পদ, সংখ্যা, দিবস, উপসর্গ, সন্ধি, সমাস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নমুনা অধ্যায়ে গৃহীত বাংলা ভাষার সাহিত্য-নিদর্শন এবং এগুলোর অনুবাদ বিশ্লেষণ করলে এন্ডার্সনের সাহিত্যরুচি সম্পর্কে অনেকখানি ধারণা পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের কথামালার গল্পগুলোর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্রাকৃতির উপন্যাস *স্বর্ণলতার* দক্ষিণাচরণ রায়কৃত অনুবাদ (প্রকাশকাল ১৯১৪, ম্যাকমিলান এ্যান্ড কোং, লন্ডন) থেকে একটি লোককাহিনী উদ্ধৃত। ১৯১৭-তে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মেজদিদি উপন্যাসের অংশবিশেষের এন্ডার্সনকৃত অনুবাদ সাম্প্রতিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর সযত্ন দৃষ্টির পরিচায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* উপন্যাসের দশম অধ্যায় থেকে অংশ বিশেষের অনুবাদ প্রসঙ্গে এন্ডার্সন উক্ত উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নও করেছেন যেটির সারমর্ম এখানে প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, উপন্যাসটি অষ্টাদশ শতকের শেষে বাংলায় মুঘল ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের কাহিনী। বন্দে মাতরম সঙ্গীত প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এটি সারা ভারতে এতটাই জাতীয়তাবাদী প্রেরণার সঞ্চারক হয়েছে যে একে ফরাসি জাতীয় সঙ্গীত লা মার্সেই-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। তিনি এটিও লক্ষ করেন যে, বিশেষ কুশলতায় সমগ্র কবিতাটি প্রায় তৎসম শব্দে রচিত যে জন্যে এটি অন্যান্য ইন্দো-আর্য ভাষাভাষীদের কাছেও সহজবোধ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *নৌকাডুবি* উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের উদ্ধৃতি অনূদিত হয়েছে *দ্য শিপ রেক* শিরোনামে। লন্ডনের ইস্ট ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বর্ণকারের আবেদন শীর্ষক পত্রটি বাংলায় রচিত আবেদনপত্রের নমুনা হিসেবে প্রদত্ত। সাংবাদিকগদ্যের শৈলী হিসেবে এন্ডার্সন বেছে নেন সঞ্জীবনী পত্রিকা থেকে একটি উদ্ধৃতি (১৯১৮ সনের ৬ জুন সংখ্যা থেকে)। পদ্যাংশের উদ্ধৃতি এবং এগুলোর অনুবাদ থেকেও এন্ডার্সনের


www.pathagar.com

সাহিত্যরুচির পরিচয় মেলে। কাশীরাম দাশের মহাভারত, কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *কালকেতু উপাখ্যান*, মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য* এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গীতাঞ্জলির* অনুবাদ প্রভৃতি যে বাংলা সাহিত্যের সুনির্বাচিত দৃষ্টান্ত তা অনস্বীকার্য।

মোট কথা, *এ ম্যানুয়েল অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ* কেবল নিয়মনিষ্ঠ একটি ভাষা বিষয়ক গ্রন্থই নয় এটি সাহিত্যগুণেও গুণান্বিত হয়ে উঠতে পেরেছে রচয়িতার অভিনিবিষ্ট পঠন পাঠন এবং বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। একটি ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করতে গিয়ে এন্ডার্সন উক্ত ভাষা ও ভাষানির্ভর সাহিত্য সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন তা এককথায় অদৃষ্টপূর্ব।

## ১.৫

জে ডি এন্ডার্সন রচিত *চিটাগাং প্রোভার্বস্* নানা কারণে উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটির পূর্ণ শিরোনাম সাম চিটাগাং প্রোভার্বস্, উপশিরোনাম এবং উদ্দেশ্য "*এ্যাজ এ্যান এক্সামপল অব দ্য ডায়ালেক্ট অব দ্য চিটাগাং ডিস্ট্রিক্ট*"—১৮৯৭ সনে প্রকাশিত হয় ৪৬, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতার হেয়ার প্রেস থেকে আর. দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এ গ্রন্থের সর্বাধিক ঐতিহাসিক মূল্য এখানে যে এটি চট্টগ্রামের প্রবাদ বিষয়ে প্রকাশিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের সাত বছর পরে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধা নামক প্রবন্ধে (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মাঘ ১৩১২) গ্রন্থটি সম্পর্কে যে স্বীকৃতি দেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য—"লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিয়াই আমাদের ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট্ মি. এন্ডারস্ন সাহেব বাহাদুর Chittagong Proverbs নামক সুন্দর গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে উপহার দিয়া গিয়াছেন।"

এটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ—মূল প্রবাদগুলো আসলে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার বাংলা বর্ণান্তর এবং সেই সঙ্গে এতে রয়েছে প্রতিটি প্রবাদের ইংরেজি গদ্যানুবাদ এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইংরেজিতে ব্যাখ্যা। প্রথমে গ্রন্থের ভূমিকাটি লক্ষ করা যাক। গ্রন্থ রচনার অনুপ্রেরণা হিসেবে এন্ডার্সন উক্ত কাজে তাঁর পূর্বসূরি ক্যাপ্টেন গার্ডনের *আসামিজ প্রোভার্বস্* গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, ক্যাপ্টেন গার্ডনের আসামি প্রবাদবিষয়ক গ্রন্থটি ১৮৯৬তে প্রকাশিত হয় শিলং থেকে। গার্ডনও এন্ডার্সনের মতো একজন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। গ্রন্থ রচনাকালে তিনি ছিলেন আসামের গোয়ালপাড়ার ডেপুটি কমিশনার। উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে প্রবাদ বিষয়ক গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার কাজ ব্রিটিশ সিভিলিয়নদের মধ্যে অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ১৮৬৯ সনে


www.pathagar.com

কলকাতার সাপ্তাহিক ইংলিশম্যান পত্রিকা থেকে নির্বাচিত প্রবাদমালায় ২৩৫৮টি প্রবাদ স্থান পায় যা সাংখ্যিক বিচারে বিস্ময়কর। এসব প্রবাদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। একই পত্রিকায় একই বছরে ক্রিলফ প্রকাশ করেন রাশিয়ার প্রবাদগুচ্ছ। এন্ডার্সন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় আরো উল্লেখ করেন যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার এসব দৃষ্টান্তকে এক ধরনের অলিখিত বক্তব্যও বলা যায়। গ্রন্থটিকে কোনোভাবেই চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনজীবনের সামগ্রিক জীবনাভিজ্ঞতার প্রতিফলন বলে দাবি করা হয়নি, বরং রচয়িতা সানন্দে নতুন নতুন প্রবাদ আহ্বান করেছেন পাঠকের কাছে। ভূমিকা থেকে জানা যায়, চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের কর্মচারী বাবু রাজচন্দ্র দত্ত গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবাদের সংগ্রাহক। দুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত ভূমিকাটির শেষটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রামের জনজীবন এবং এখানকার সংস্কৃতি যে লেখককে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল তার প্রতিফলন এটি। শুধু তাই নয়, নানা ধর্মের মানুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা অঞ্চলটির লোককাহিনী যে অসাধারণ আকর্ষণের আকর হতে পারে সে ব্যাপারেও জোর দেন এন্ডার্সন। মূল ইংরেজি ভূমিকাংশটুকু প্রণিধানযোগ্য—

"I trust someone may be induced to take in hand the local folk stories, which on this border land of Hinduism and Buddhism and Islam are probably unusually interesting. The task requires more leisure and patience than I have been able to devote to it."

*দ্য চিটাগাং প্রোভার্বস্* গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯০ এবং এতে মুদ্রিত হয়েছে সর্বমোট ৩৫২টি প্রবাদ ও সেগুলোর ইংরেজি অনুবাদ। ভূমিকাংশে গ্রন্থের সংগ্রহকে সামগ্রিকতামণ্ডিত বলে দাবি করা না হলেও সংগৃহীত মুদ্রিত প্রবাদসমূহকে এক অর্থে সুচিন্তিত নির্বাচন বলা যায়। প্রবাদগুলোর মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে চট্টগ্রামের লোকোজীবন। জীবনাভিজ্ঞতার সারাৎসারনির্ভর এসব প্রবাদে সমাজ-সংস্কৃতি-লোকাচারের বহুমাত্রিক রূপ প্রতিভাসিত। পাশাপাশি লোকোচরিত্রের এবং জনরুচি ও বাগবৈদগ্ধের সামাজিক রূপটিও মূর্ত। গ্রন্থ রচনাকালে এন্ডার্সন যে চট্টগ্রামের প্রবাদ বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা পেতে যাচ্ছেন তা তিনি অবহিত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করেও বলা যায় এটি অত্যন্ত পরিশীলিত-পরিমার্জিত এবং দায়িত্বপূর্ণ একটি সমাজ বিষয়ক গ্রন্থ।

গ্রন্থভুক্ত কয়েকটি প্রবাদ লক্ষ করা যাক :

ক. দুধ দেওন্যা গাইয়ে লাথি দেয়নও ভালা। (১-সংখ্যক)

খ. মাঝি ভাত্ খাইলে, গাঙ্গে জোয়ার হয়। (১৭-সংখ্যক)

গ. পোন্দত নাই তেনা
মিডা দি' মেশ্রী পানা। (১৯-সংখ্যক)


www.pathagar.com

ঘ. চুমুট্টা দিলে ভামুট্টা খায়। (২২-সংখ্যক)
ঙ. লেজ নাই কুত্তার বাঘ্যা নাম। (২৮-সংখ্যক)
চ. ভাত ছিগুলে কাউয়ার্ রাট্ নাই। (৫২-সংখ্যক)
ছ. আট্ কামুয়ার ভাত নাই। (৫৩-সংখ্যক)
জ. গরুরে জিগাই হাল্ ন চয়। (৫৬-সংখ্যক)
ঝ. হক্কলে যদি বত্ করে নৈবিদ্য খাইবে কনে। (৬৬-সংখ্যক)
ঞ. তেল নদি মচ্মচ্যা ভাজা। (৯৮-সংখ্যক)
ট. ঘাট্ পার্ হৈলে ঘাট্যা হালা। (১৯০-সংখ্যক)

কোনো কোনো প্রবাদের ক্ষেত্রে এন্ডার্সন তুলনামূলক বিচার করেছেন। বিশেষ করে, ক্যাপ্টেন গার্ডনের আসামি প্রবাদ বিষয়ক গ্রন্থের অনেকগুলো প্রবাদ সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সাদৃশ্য বোঝানোর জন্যে। এতে করে গ্রন্থের মর্যাদা যেমন বেড়েছে তেমনি দুই বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্নতা সত্ত্বেও লোকোজীবনের ঐক্যসূত্রের প্রেক্ষাপটটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে।

চট্টগ্রামের সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্রে জে ডি এন্ডার্সন আদি পুরুষদের অন্যতম এবং দ্য চিটাগাং প্রোভার্বস্ চট্টগ্রামের প্রবাদ বিষয়ক সর্বপ্রথম গ্রন্থ। একজন বিদেশী বিভাষীর জন্যে এ মর্যাদা সুদুর্লভ।

## ১.৬

ভাষা-সাহিত্য ও সমাজ গবেষক জে ডি এন্ডার্সনের *ইন্দিরা এ্যান্ড আদার স্টোরিজ* গ্রন্থ তাঁকে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাথমিক যুগের এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত রচনার প্রথম অনুবাদকের মর্যাদা দান করেছে। এ গ্রন্থে সৃজনশীল সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক এন্ডার্সনের সৃজন ক্ষমতার বহুবিধ পরিচয় দৃষ্ট হয়। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় দক্ষতার কারণে বঙ্কিমের অনুবাদের ক্ষেত্রে এন্ডার্সন যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। ১৭৯ পৃষ্ঠার উক্ত অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশকাল ৪ নভেম্বর ১৯১৮ সন ; প্রকাশক, ২১০/৩/১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতার আর. চ্যাটার্জি ; মুদ্রক, ৭১/১, মির্জাপুর স্ট্রিট, কলকাতাস্থ শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেসের পক্ষে এস. সি মজুমদার। গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ বঙ্কিম-সাহিত্য অনুসরণে কৃত চিত্রকর নন্দলালবসুর দুটি চিত্র (দীঘিতে দৃষ্টিরত ইন্দিরা এবং রথের মেলায় রাধারাণী)। উক্ত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ইন্দিরা, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয় এবং লোকরহস্য গ্রন্থের প্রথম রচনা ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল—এ চারটি রচনার অনুবাদকর্ম।

অনুবাদের ক্ষেত্রে এন্ডার্সন আক্ষরিকের পরিবর্তে ভাষান্তরের আশ্রয় নিয়েছেন। বঙ্কিমের তৎসম শব্দের প্রাধান্য সহজ-সাবলীল করে নিয়েছেন অ-


www.pathagar.com

জটিল ইংরেজি বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে। কখনো কখনো মূলের দীর্ঘ বাক্য প্রক্রিয়াকে ভেঙে উপবাক্যে কিংবা একাধিক বাক্যের বিন্যাসে সাজিয়েছেন। এতে করে মূলের কাঠিন্য অনেক ক্ষেত্রে মসৃণ ও গতিময় হয়েছে। বঙ্কিমের মূল রচনার সঙ্গে এন্ডার্সনকৃত অনুবাদের কয়েকটি উপস্থিত করা যাক—

(১) "অনেক দিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্য্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র। বিবাহের কিছু দিন পরেই শ্বশুর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না; —বলিলেন, "বিহাইকে বলিও যে, আগে আমার জামাতা উপার্জ্জন করিতে শিখুক—তারপর বধূ লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি ?" (ইন্দিরা, প্রথম খণ্ড: প্রথম পরিচ্ছেদ)[৯]

"At last I was being conveyed to my husband's home. My nineteenth birhday was past, and yet, contrary to Hindu costoms, I had never left the home of my childhood. Why ? The explanation is simple. My father was wealthy, my father-in-law poor. A few days after the wedding—I was only a child at the tim— my father-in-law, in accordance with custom, sent people to fetch me away, but my father refused to part with me. "Let my son-in-law", he said", first learn how to earn his own living. How can he maintain a wife under existing circumstances ?" (গ্রন্থে ১-সংখ্যক পৃষ্ঠা)

(২) "রাধারাণী নামে এক বালিকা মহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভালো ছিল—বড় মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই। তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়, সর্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা ; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল।" (রাধারাণী, প্রথম পরিচ্ছেদ)[১০]

"A Little girl called Radharani had been to the village of Mahesh in order to witness the exciting ceremony of pulling the Juggennath car. She was hardly eleven years of age. Time was when her people had been very wealthy, for the child came of a great family in these parts. But when her father died a relative brought a civil suit against her widowed mother. The suit involved the whole of the


www.pathagar.com

family property. The widow lost her case in the Calcutta High Court." (গ্রন্থে ৫১-সংখ্যক পৃষ্ঠা)

উদ্ধৃতাংশদ্বয়ের প্রথমটিতে দেখা যাবে এন্ডার্সন বক্তব্যকে স্পষ্ট এবং বাক্যকে গতিময় করবার জন্য বঙ্কিমের গদ্যশৈলীকে যথাসম্ভব ইংরেজি বাগভঙ্গিতে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন মূলের হ্যাঁ-বোধক "কারণ" শব্দকে অনুবাদে প্রকাশ করা হয়েছে প্রশ্নবোধক "হোয়াই" শব্দের মাধ্যমে। তাছাড়া বক্তব্যকে স্বচ্ছ করবার জন্যে অনুবাদে বাড়তি বাক্যের প্রয়োগ লক্ষণীয়। যথা, উদ্ধৃতির তৃতীয় বাক্যটি। স্বাধীনতা নিলেও অনুবাদক এখানে মূলের মেজাজটিকে অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছেন। রাধারাণীতে মূলে যেখানে শুধু 'হাইকোর্ট' শব্দ রয়েছে সেখানে অনুবাদে তা হয়েছে 'ক্যালকাটা হাইকোর্ট'। অনুবাদে 'ক্যালকাটা' স্থানবাচক শব্দটির প্রয়োগ সুচিন্তিত। প্রথমত রাজধানী শহর কলকাতার উল্লেখে মামলাটির গুরুত্ব এবং গ্রাম শহরের দূরত্ব এবং মামলাটির প্রক্রিয়াগত দীর্ঘত্বের বিষয়টি স্পষ্টতা পায় যা ইংরেজ পাঠকের জন্যে উপযোগী। বঙ্কিমের লোকরহস্যর ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল শিরোনাম অনুবাদে হয়েছে ডক্টর ম্যাকররাস। এটি গ্রিক শব্দ যার ইংরেজি অর্থ "ডক্টর লং টেল্‌ড্ টাইগার", বাংলায় "দীর্ঘ লেজবিশিষ্ট ডক্টর ব্যাঘ্র"। এক্ষেত্রেও শিরোনামের গুরুগম্ভীরতা বিদেশী ভাষান্তরে রক্ষিত হয়েছে। তবে এন্ডার্সনের অনুবাদের সাবলীলতা সত্ত্বেও লক্ষণীয়, তৎসম শব্দের প্রাধান্য বঙ্কিমের উপন্যাসে যে নান্দনিক আবহ সৃষ্টি করে সেটি অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজিতে অনুপস্থিত। এটি অনুবাদকের ব্যর্থতা নয়। এটি ইংরেজি ভাষার সীমাবদ্ধতা। "ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল" যে ব্যঙ্গ এবং বক্তব্যের বঙ্কিমতার সঞ্চারক ইংরেজিতে তা অপসৃত। এটিও সত্য, প্রায়শ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর মূলের সমস্ত খুঁটিনাটিকে সর্বদা হাজির করতে পারবে এমন নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্নধর্মী সাহিত্যের অনুবাদে জে ডি এন্ডার্সন পথিকৃতের গৌরববাহী। কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনুবাদক হিসেবে তাঁর ঐতিহাসিক অবস্থানটি সুদৃঢ়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বহু বিদেশী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ সম্পর্কে আলোচনা ও মূল্যায়ন হয়েছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরেও সেই ধারা বজায় ছিল। কিন্তু জে ডি এন্ডার্সনের মতো বহু বিষয়ে পারদর্শী একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক-গবেষক-অনুবাদক সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর পর (১৯২০) থেকে বিগত সাতাশি বছরেও তেমন কোনো মূল্যায়ন হয়নি। অথচ বাংলা ভাষা সম্পর্কিত গবেষণা, চট্টগ্রামের প্রবাদ বিষয়ক মূল্যবান সমাজ গবেষণা এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যানুবাদ—অন্যান্য ক্ষেত্র ছেড়ে দিলেও অন্তত এই তিনটি ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। কোনোরূপ অর্থসংক্রান্ত উন্নয়ন-উদ্দেশ্য কিংবা বৈষয়িক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে তিনি বাংলা ভাষা সাহিত্যে গবেষণার


www.pathagar.com

পথে যাননি, বাংলা ভাষা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি প্রাণের টানেই এন্ডার্সন সে পথের অভিসারী। উইলিয়ম রাদিচে তাঁর *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সন্ধানে*[১১] নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, "আমার মনে হয়েছে বাংলা ভাষার এই ভাব ও রসের সম্মিলনটা এত উঁচুদরের যে বাংলা ভাষা চর্চা করলে পৃথিবীর অনেক ভাষাই সঠিক চেতনায় বোঝা সম্ভব।...এটা আমি আশা করি না যে সবাই বাংলা শিখবে, তবে আজকের এই যন্ত্রসভ্যতার যুগে যেখানে পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষা ধ্বনিমাধুর্য হারিয়ে ফেলছে...সেখানে ভাষার প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাংলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেই পারে। যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদনের মতো লেখক আছেন সেখানে এটা হবে নাই বা কেন ?...সুতরাং আমরা আশা করতেই পারি যে বাংলা ভাষা পৃথিবীতে তার সঠিক জায়গা পাবে ; পূর্ণ চাঁদের মতো এর দীপ্তি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং এর ফলে পৃথিবীতে ভাষাচর্চার সামগ্রিক উন্নতি হবে।" আজ থেকে কিঞ্চিদধিক শতাব্দীকাল আগে জে ডি এন্ডার্সন ঠিক একই রকম উপলব্ধির প্রেরণায় বাংলা ভাষাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তাঁর জীবনের এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত মূল কর্মগুলোই বাংলা ও বাঙালিকে কেন্দ্র করে সাধিত। বর্তমান প্রবন্ধ তাঁর সেই মহান ভূমিকার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নমাত্র। হয়ত বা এই মনীষা সম্পর্কে বিশদতর জানা গেলে, তাঁর আরো কর্ম আবিষ্কৃত হলে তাঁর অন্যতর পরিচয়ও উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব।

## পাদটীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. ৪র্থ খণ্ড, ১৯৪৭, পৃঃ ৮৯।

২. ৫ম খণ্ড, ১৯৪৮, পৃঃ ১০৩।

৩. ১৯২১ সনে, এন্ডার্সনের মৃত্যুর পরের বছর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত।

৪. বর্তমান প্রবন্ধকার (১৯৯২-১৯৯৭ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে) ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এবং এন্ডার্সনের পুরনো কর্মস্থল গনভিল্ এ্যান্ড কী'জ কলেজে অনুসন্ধান চালিয়ে অবহিত হন যে ১৯২০-এ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য ব্যক্তির অভাবে অথবা অন্য কোনো কারণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা উঠে যায়। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র, এক কন্যা এবং বিধবা স্ত্রীকে রেখে যান। এন্ডার্সনের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় এবং পরিবারের সদস্যদের সম্মতিক্রমে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ, যেগুলোর অধিকাংশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক দুর্লভ গ্রন্থ, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিকে দান করা হয়। তাঁর


www.pathagar.com

সম্মানে "এন্ডার্সন কক্ষ" নামে একটি পাঠকক্ষ রয়েছে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে।

৫. পত্র লেখক সতীশ চন্দ্র ঘোষ তখন রাঙামাটি হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক। সতীশচন্দ্র ঘোষের ইংরেজিতে লেখা মূল পত্রটি বর্তমান প্রবন্ধকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। পত্রপ্রাপক এ চিঠির উত্তর দিয়েছেন ১১মে ১৯১৭তে। প্রাপকের হস্তাক্ষরে তারিখটি পত্রের গায়ে লিপিবদ্ধ আছে।

৬. প্রকাশক, কেম্ব্রিজ ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১৯২০।

৭. এটি একটি দীর্ঘ চিঠি, গ্রন্থে ১৪৯-১৫৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রিত। ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ছাড়াও এতে বাংলা ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব মূল্যায়ন রয়েছে যা প্রকারান্তরে ছোটখাট একটি প্রবন্ধের রূপ নিয়েছে। এই পত্রোস্থিত ছন্দের আলোচনা অংশ পরবর্তীকালে (এবং এন্ডার্সনকে লেখা আরো একটি পত্র) ১৩২১ সনের সবুজপত্র-এর জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ সংখ্যায় এবং ভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়। পত্রিকায় প্রকাশকালে এগুলোর শিরোনাম দেয়া হয় বাংলা ছন্দ। পত্রগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছন্দ (প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩) গ্রন্থের (দ্রষ্টব্য : বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র রচনাবলীর একাদশ খণ্ড, প্রকাশকাল ১৪০২) অন্তর্ভুক্ত। পত্রটি স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর সম্পাদিত ভারতী পত্রিকায় ছাপতে চাইলে "কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপক" জে ডি এন্ডার্সন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্মতিজ্ঞাপক যে পত্রটি পাঠান তা রবীন্দ্র রচনাবলীর পূর্বোক্ত খণ্ড থেকে (গ্রন্থপরিচয়, পৃ: ৬৮১) উদ্ধার (অংশত) করা যেতে পারে। এতে এন্ডার্সনের সাহিত্যরুচি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে তাঁর ধারণার একটি পরিচয়ও পাওয়া যাবে—"It would be a thousand pities if the charming and most interesting letter which our Kavivar has been so good as to address to me were not published. Will you kindly present my respects to Mr. Tagore's dishtinguished sister and assure her that, so far as I am concerned, the letter is very much at her disposal. I wonder if you would be kind as to send me the copy of the Bharti in which it appears ?

The letter seems to me to be a marvel of poetic wit and wisdom, the metaphorical illustrations being especially delightful and illuminating. I have only read it through, and have not had time to think out the various problems it discusses. But it has been a sheer delight to read matter so suggestive and original. The critical works of the poets in England (Dryden was a remarkable exception) is often


www.pathagar.com

not so interesting as their verses. But Mr. Tagore's letter is as full of matter of thought as one of Victor Hugo's prefaces, and I am not a little proud that he should have addressed his remarks to a[n] old গুরুমহাশয় like me."

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এন্ডার্সনের উচ্চ ধারণা ও প্রশস্তি পত্রটিতে প্রতিফলিত। ইংরেজ কবিদের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সৃজনশীল রচয়িতার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-সমালোচকের মর্যাদা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্যপূর্ণ চিঠিকে তুলনা করেছেন ভিক্টর হুগো রচিত তাঁর নিজস্ব উপন্যাসসমূহের ভূমিকার সঙ্গে।

৮. পরবর্তী অংশই ছন্দ গ্রন্থের চিঠিপত্র শীর্ষক ছন্দ বিষয়ক প্রবন্ধ।

৯. বঙ্কিম রচনাবলী, চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৩৮৪, পৃ: ৫৮৫।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৪৯।

১১. অনুষ্টুপ, উনত্রিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ: ১৭২-১৭৩।


www.pathagar.com

# ঔপনিবেশিক শিক্ষা : দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিত

ভূমিব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর মতো শিক্ষাকেও তদ্রূপ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় বিন্যস্ত করবার অভিলাষ ব্রিটিশদের গোড়া থেকেই ছিল। তাদের নানা উদ্যোগে সেসব প্রমাণ ধরা আছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশদের আয়োজনে বাংলায় যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে তাদের পরিপোষণার ধারণা শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মিশনারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ধারাবাহিক কর্মযজ্ঞ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা, দিগ্‌দর্শন প্রকাশ এবং ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সেই ধারণার বহিঃপ্রকাশ। মোটকথা শিক্ষাকে কালক্রমে একটি শক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর মানসিকতা সক্রিয় ছিল ব্রিটিশদের মধ্যে। এরপর পুরো উনিশ শতক জুড়ে ব্রিটিশদের শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন ঘটে সেই ধারাতেই। ২৮২৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত জে ডি পিয়ার্সনের 'ইন্‌ট্রোডাকশন্স ফর মডেলিং এ্যান্ড কন্ডাক্টিং স্কুল্‌স্' গ্রন্থে ব্রিটিশদের বিদ্যালয়-পরিকল্পনার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে ছাত্রদের জন্যে 'খড়ের কিম্বা খাপরেলের ঘর'-এর ব্যবস্থা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের আক্ষরিক প্রস্তাবনা রয়েছে—

> "সেই ঘরের চতুর্দিকে দরজার কিম্বা মৌলার বেড়া দিবে, ঘরের মধ্যে আলো হইবার নিমিত্তে তিন দিকের মধ্যস্থানে জাফরী অর্থাৎ বাখারী দিয়া ফাক ২ করিয়া বেড়া দিবে, এবং জলের ছাইট বারণের নিমিত্তে সেই জাফরীতে পরদা করিয়া দিবে। ঘরের দ্বার যেদিকে রাখিবে, সেই দিকে জাফরী দিবে না এবং সেই দিকে বড়ো ডেস্ক রাখিবে। অথবা দেওয়ালের ঘর করিবে, এবং ঘরের মধ্যে পড়ুয়াদের বসিবার নিমিত্তে দেড় হাত ওসার সপ কিম্বা অন্য বিছানা পাতিবে। ডেস্কের সম্মুখে কালীর তক্তা পাতিবে, আর পড়ুয়াদের লিখিবার নিমিত্তে আধ হাত ওসার এমত কাষ্ঠের তক্তা করিয়া দিবে। ঘর আচ্ছা শক্ত করিয়া করিবে, এবং পড়ুয়াদের সংখ্যা বুঝিয়া তদুপযুক্ত প্রশস্ত ও দীর্ঘ করিবে, পাঁচ শত পর্যন্ত পড়ুয়াকে একি পাঠশালায় শিক্ষা করিতে পারা যায়।"


www.pathagar.com

বোঝা যাচ্ছে পিয়ার্সন এবং উদ্যোক্তারা বিদ্যালয়মুখী ছাত্রসংখ্যার বিষয়ে আশাবাদী। 'পাঁচ শত পর্যন্ত' পড়ুয়ার জন্য একটি স্কুলের ব্যবস্থা থেকে সমগ্র বাংলায় তাঁদের শিক্ষা-আয়োজনের ব্যাপ্তি অনুধাবনযোগ্য। পিয়ার্সনের গ্রন্থে আরো আছে "পাঠশালা বসাইবার কারণ, মনিটর নিযুক্তকরণের বিবরণ, শিক্ষকের কর্মের বিবরণ, পাঠ শিখিবার ও পড়িবার ধারা, রেজস্টরি কিতাবের বিষয়, অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির হিসাবের বহির বিষয়, ক খ শিখিবার বিবরণ, বানান ও ফলা শিখিবার বিবরণ, স্লেটে লিখিবার বিষয়, পাঠ পড়িবার বিষয়, অর্থ জিজ্ঞাসার দৃষ্টান্ত, বানান করিবার ধারা, গণিতাঙ্ক, তেরিজ, জমা খরচের ধারা, নামতা, অর্থাৎ পূরণ, হরণ, পাঠশালার কুধারা, তদারককর্তার এবং শিক্ষকের কর্মের বিবরণ" ইত্যাদি। মোটকথা অল্প বয়স্ক ছাত্রদের শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের নানা দিক স্পর্শ করবার প্রচেষ্টা এতে প্রতিফলিত।

জে ডি পিয়ার্সন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্ত বাংলা অঞ্চলের স্কুলসমূহের সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন। ইতিপূর্বে (১৮২২ সালে) তাঁর 'পত্রকৌমুদী, পাঠশালার নিমিত্তে' প্রকাশিত হয় ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি থেকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ বেরোয়। ১৮২৫ সালে প্রকাশিত উইলিয়ম ইয়েটসের 'ইলেমেন্টস্ অব ন্যাচারাল ফিলসফি এ্যান্ড ন্যাচারাল হিস্ট্রি, ইন এ সিরিজ অব ফ্যামিলিয়র ডায়ালগস্, ডিজাইনড ফর দ্য ইন্ট্রোডাকশন অব ইন্ডিয়ান ইয়থ' গ্রন্থটিতে 'গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনে বিজ্ঞান শিক্ষার' রীতি তুলে ধরা হয়। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'দিগ্‌দশন'-পত্রিকার বহু রচনায় এরকম কথোপকথন পদ্ধতির জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা লক্ষ করা যায়। আবার ১৮২০-এর পর থেকে ১৮২৪ সাল পর্যন্ত এই ৪/৫ বছরে ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটির আরেকখানা গ্রন্থ পাঠকপ্রিয়তা পায়। গ্রন্থটি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক—'পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত ও কথোপকথন'। এটির লক্ষ্য—'হিন্দু ফিমেল এডুকেশন'। দেখা যাচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়টি কোম্পানি এবং মিশনারিদের লক্ষ্য এবং একে জনমনে প্রচার ও প্রসারের ইচ্ছাতেই সংলাপ কিংবা পত্রনির্ভর রচনা ও গ্রন্থের আশ্রয়। এ গ্রন্থের খানিকটা উদ্ধৃতি থেকে উনিশ শতকের গোড়ার দিককার সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাভাবনা, ব্রিটিশ মিশনারিদের ইংরেজিশিক্ষার আয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র মেলে—

"প্রথম ভাগ। দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন।

প্র। ওলো, এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা ! কালে ২ কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে ?

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এতকালের পর আসাদের কপাল ফিরিয়াছে এমন জ্ঞান হয়।


www.pathagar.com

প্র। কেন গো ? সেসকল পুরুষের কায ; তাহাতে আমাদের ভালো মন্দ কি ?

উ। শুন লো ? ইহাতে আমাদের ভাগ্য বড় ভালো বোধ হইতেছে ; কেননা এ দেশের স্ত্রী লোকেরা লেখাপড়া করে না, ইহাতেই তাহারা, প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কাযকর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল, লেখাপড়া শিখিলে কি ঘরের কাযকর্ম্ম করিতে হয় না ? স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন ? তাহা কি পুরুষে করিবে ?

উ। না, পুরুষে করিবে কেন ? স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখাপড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাযকর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দন্ড লেখাপড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।... ... ...

প্র। ভালো দিদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সাহেবলোকের পাঠশালায় গিয়া লেখাপড়া শিখিতে কি দোষ হয় ?

উ। না, তাহাতে কোন দোষ নাই। কেবল আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের লেখাপড়ার পদ্দি আগে ছিল না, এই জন্যে কিছু দিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ সালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেবলোকেরা এই কলিকাতার নন্দন বাগানে যুবনাইল পাঠশাল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না ; এই ক্ষণে এই কলকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক পাঠশালায় ন্যূন সংখ্যাতে ১৬জন কন্যা গণনা করিলেও ৮০০ কন্যার শিক্ষা হইতেছে। ইহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই।"

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটি ব্রিটিশশিক্ষার সূচনাকালের পরিস্থিতি প্রকাশ করেছে। তখন ব্রিটিশ শিক্ষা এক অর্থে মিশনারি শিক্ষা এবং মিশনারিদের উদ্যোগেই নারীশিক্ষারও ব্যবস্থা। যদিও দেশীয় মানসিকতা সেসময়টাতে মিশনারি শিক্ষাকে খ্রিষ্টধর্ম-প্রচারণার সঙ্গে এক করে দেখে। নারীশিক্ষা বিষয়ে স্থানীয়দের অনীহা ও কুসংস্কারের প্রসঙ্গ ব্রিটিশদের রচিত বিভিন্ন লেখায়-পত্রপত্রিকায় সবসময়েই গুরুত্ব পায়। তবে নারীশিক্ষার গতি ছিল উর্ধ্বমুখী ও আশাব্যঞ্জক। যদিও এটা সত্য, নারীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারি স্কুলের চেয়ে মিশনারি স্কুল ছিল অগ্রগামী। আর মিশনারিমুখী নারীরা ছিল মূলত দরিদ্র-অনাথ। ১৮২৪ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'করেসপন্ডেন্স রিলেটিভ টু প্রসপেক্টস্ অব ক্রিশ্চিয়্যানিটি, এ্যান্ড দ্য মিন্‌স্ অব প্রোমোটিং ইট্‌স্ রিসেপশন ইন ইন্ডিয়া' উনিশ শতকের প্রথম সিকি শতাব্দীর শিক্ষা-সমাজ-খ্রিষ্টধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে চমৎকার ধারণা দেয়। ১৮২৩ সালের ২৪ এপ্রিল হার্ভার্ড কলেজ-এর ধর্মততত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপক হেনরি ওয়েন বাংলায়


www.pathagar.com

বসবাসরত রেভারেন্ড এ্যাডামকে ভারতবর্ষে খ্রিষ্টীয় মিশন সম্পর্কে ২০টি প্রশ্ন প্রেরণ করেন। কলকাতা থেকে রেভারেন্ড এ্যাডাম ১৮২৩-এর ২৪ ডিসেম্বর পাঠান প্রত্যুত্তর। এ প্রশ্নোত্তর-পর্বে রেভারেন্ড এ্যাডামের নিজস্ব মত প্রাধান্য পেলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রশ্নসমূহের সারমর্ম অনুসারে বলা যায় প্রথমেই গুরুত্ব পেয়েছে ড. ইউলিয়ম কেরীর মিশনারি তৎপরতা। এরপর স্থানীয় ভাষায় বাইবেল-অনুবাদ এবং বাইবেল সোসাইটির কর্মকাণ্ড। বাইবেল-প্রচারণার কৌশলও উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় এ্যাডামের কাছে। এতে করে জনসম্পৃক্ততা ঘটে এবং মিশনারি শিক্ষাকে সফল করবার জন্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসঙ্গটি চলে আসে সমান্তরালে। যুবক-যুবতিদের জন্যে মিশনারিরেদ স্থাপিত বোর্ডিং স্কুল এবং এক্ষেত্রে ড. মার্শম্যান ও তাঁর স্ত্রীর ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দেন এ্যাডাম। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মিশনারি স্কুলগুলোও স্থানীয়দের মধ্যে শিক্ষাচিন্তার উন্মোষ ঘটাতে সহায়ক হয়। এছাড়া মুদ্রিত পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও উল্লেখ করবার মতো। ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া (১৮১৮) এবং দিগ্‌দর্শন (১৮১৮) পত্রিকা ছাড়াও দ্য মিশানারি ইন্টেলিজেন্স, দ্য মিশনারি হেরাল্ড, দ্য মিশনারি ক্রনিকল, দ্য ইউনিটারিয়ান রিপজিটরি, দ্য গসপেল ম্যাগাজিন, দ্য এশিয়াটিক অবজার্ভার একই সঙ্গে মিশনারি এবং শিক্ষা-কর্মকাণ্ড প্রচারে কার্যকর ভূমিকা রাখে। বলা যায় ১৮৩৫-এর সরকারি উদ্যোগ-এর পূর্ব পর্যন্ত বাংলার শিক্ষায় মিশনারি তৎপরতা ছিল সর্বব্যাপী।

রেভারেন্ট এ্যাডাম-এর পত্রোত্তরে ধর্মান্তর সাপর্কেও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। জানা যায়, ১৮১১ সাল পর্যন্ত পর্যন্ত ভারতে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানের সংখ্যা ছিল ১৪০। ১৮২২-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত কোয়ার্টার্লি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার তথ্য থেকে জানা যায় ভারতে নেটিভ খ্রিষ্টানের সংখ্যা এক হাজারের অধিক। ১৮২০-এর মে মাসে প্রকাশিত ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া থেকে জানা যায় যে ধর্মান্তরিতরা শ্রীরামপুর মিশন এবং অন্যত্র কর্মরত। ধর্মান্তরিত তথা নেটিভ খ্রিষ্টানদের নতুন ধর্ম গ্রহণের ফলে তাদের জীবনে সূচিত পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণাও মেলে। বলা হয়েছে, দেশীয় খ্রিষ্টানেরা ভারতীয়দের মধ্যে সেরা বলে প্রমাণিত। উদ্যমে, ঋজুত্বে, মেজাজ ও ব্যবহারে তারা ছাড়িয়ে গেছে অন্যদের। তবে একটা কথা সত্য, অশিক্ষার কারণে ধর্মান্তরিতরা ধর্মগ্রন্থ পড়তে অক্ষম। ফলে নতুন ধর্মের দিকগুলো তাদের অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে উঠতে পারেনি। একমাত্র শিক্ষাই তাদের অবস্থার উন্নতিতে প্রতিষেধকের ভূমিকা পালন করতে পারে বলে রেভারেন্ড এ্যাডাম তাঁর মত ব্যক্ত করেন।

রেভারেন্ড এ্যাডাম-এর ব্যক্তিগত মূল্যায়ন বস্তুত ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির সমষ্টিগত চিন্তার সমধর্মী। প্রাতিষ্ঠানিকতার আশ্রয়ে স্থানীয়দের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো ছিল এর মূল অভিপ্রায়। ১৮১৭ সালের মে মাসে


www.pathagar.com

সোসাইটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এবং সোসাইটি আত্মপ্রকাশ করে ১৮১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর। স্কুলসমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের সহজপাঠ্য পুস্তক প্রচার সোসাইটির অন্যতম সকল কাজ হিসেবে পরিগণিত। এছাড়া স্কুলপরীক্ষায় ভালো ফল অর্জনকারী ছাত্রদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হয়। সেসঙ্গে সোসাইটি তাদেরকে ভবিষ্যতের শিক্ষকরূপে কর্মনিয়োগ দেয়াতেও উদ্যোগী ছিল। ১৮২২ সালে স্কুল সোসাইটির প্রবর্তনায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা। এতে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র ছাড়াও ৪০ জন ছাত্রীও অংশ নেয়। পরবর্তীতে বিদ্যালয়-পড়ুয়া ছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। বাড়তে থাকে ছাত্রীস্কুলের সংখ্যাও। ব্রিটিশদের সরকারি শিক্ষানীতি প্রণয়নের (১৮৫৪) পূর্ব পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীকালকে বলা যায় শিমনারি-সাধিত শিক্ষাকর্ষণ কাল। এ কালপরিবৃত্তে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা মিশনারিদের উদ্যোগ-আয়োজনে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামেও পৌঁছে যায়।

ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা একসময়ে একটি স্বতন্ত্র-স্বাধীন সত্তা অর্জনে সক্ষম হলেও দীর্ঘকাল তা মিশনারি কর্মতৎপরতার অংশ হিসেবেই বিদ্যমান ছিল। ১৬৯৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি প্রচারপত্রে স্পষ্টত বলা হয় যে ভারতবর্ষের মহান সৃষ্টিকর্তার বাণী এবং যিশুর মহিমা প্রচারই তাদের লক্ষ্য। প্রচারপত্রটি তারা ভারতবর্ষে স্থাপিত তাদের ফ্যাক্টরিগুলোতে সেঁটে রাখত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মূল কর্ম ছিল যদিও ব্যবসাবাণিজ্য। এরপর থেকে ১৮৩৫-এ উইলিয়াম এ্যাডামের শিক্ষারিপোর্ট প্রণয়নকাল পর্যন্ত এই একশো চল্লিশ বছরে সব ধরনের শিক্ষাকেই ধর্মীয় মিশনের একটি উপকরণরূপে বিবেচনা করা হয়। মিশনারিদের মধ্যে এমন ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে শিক্ষার মাধ্যমে স্থানীয়দের জীবনকে উন্নত করতে পারলে তারা নিজেরাই খ্রিষ্টধর্ম বরণ করে নেবে। ফলে ধর্মপ্রচারের সমান্তরালে শিক্ষাও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্ররূপে বিবেচিত হয় তাঁদের নিকটে। আবার ইংরেজিশিক্ষার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নিজেদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলা যাবে বলে ধারণা করত শাসকগোষ্ঠী। সে সময়কার প্রশাসনিক কর্তব্যক্তিদের বক্তব্য-বিবৃতিতে এর বহু নজির মেলে।

১৮১৫ সালে লর্ড হেস্টিংস এক বক্তব্যে জানান যে গ্রামের স্কুলশিক্ষকেরা তাঁর বিবেচনায় বিনয়ী ও নিরীহ বটে কিন্তু খুব মূল্যবান। তাঁরা সবদিক থেকে মর্যাদাপূর্ণ আসনের দাবিদার। মনে রাখা দরকার তখনো বাংলার গ্রামে স্কুল শিক্ষকশ্রেণী সেরকম গণ্য হয়ে ওঠেনি। হেস্টিংস হয়ত ভবিষ্যতের একটি চিত্র আগেই আঁকতে পেরেছিলেন মনে মনে যে একদিন এই শ্রেণীটি বাংলাদেশের গ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাবাহী হয়ে দেখা দেবে। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে মিশনারি অমিশনারি তথা সরকারি বক্তব্য নানাভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কখনো পত্র-পত্রিকায় কখনো বা আনুষ্ঠানিক উপলক্ষকে ঘিরে। অনেক পরে ১৮৩৫-এ ম্যাকলের মিনিটে যে শ্রেণীর অপরিহার্যতা ঘোষিত হয় তার ভিত্তিভূমি উনিশ


www.pathagar.com

শতকের গোড়া থেকেই প্রতিষ্ঠিত ও সংস্কৃত হতে থাকে। ১৮১৭-তে ড. মার্শম্যান তাঁর 'হিন্ট রিলেটিভ টু নেটিভ স্কুলস' শীর্ষক রচনায় বলেন যে, বর্তমানে যে কৃষক বা কারিগর হয়ে কাজ করে যাচ্ছে তাকে লেখাপড়া, ভাষার দক্ষতা বা অঙ্ক শেখানো গেলে সে আর প্রবঞ্চনা-প্রতারণার শিকার হয়ে থাকবে না। শিক্ষাই রক্ষাকবচ হয়ে উঠবে তার জন্যে। ১৮৩৫-এর ২ জানুয়ারি লর্ড উইলিয়ম বেনিস্টংককে লেখা ইউলিয়াম এ্যাডামের পত্র থেকে দেখা যায়, পত্রলেখকের দৃঢ় বিশ্বাস জাতিধর্মনির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করা গেলে নাগরিকদের জীবন উন্নত হয়ে উঠবে এবং পরিণামে লাভবান হবে ব্রিটিশরাই। চার বছরের পরিশ্রমের পর তিনটি রিপোর্টের শেষে ১৮৩৮ সালের ২৮ এপ্রিল এ্যাডাম গভর্নরকে জানান যে শিক্ষা ছাড়া আর কোনোভাবেই সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না জনগণের সঙ্গে। শিক্ষার মাধ্যমেই উভয়ের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র নির্মিত হতে পারে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে মিশনারি-অমিশনারি উভয়ের সক্রিয়তা লক্ষণীয়। যদিও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা ভিন্নমতাবলম্বী ছিল। মিশনারিরা চেয়েছিল শিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণকে তাদের ধর্মীয় প্রচারণার হাতিয়ারে পরিণত করতে ; অন্যদিকে, অমিশনারি বা প্রশাসকপক্ষ চায় জনগোষ্ঠীর একটা নির্বাচিত অংশকে প্রশাসন চালানোর পক্ষে উপযোগী করে তুলতে। ফলে শিক্ষা নিয়ে এই দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকে। মিশনারিদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ধর্মকেন্দ্রিক হলেও এটা অনস্বীকার্য, একেবারে নিম্নস্থ হতদরিদ্র লোকটিকেও শিক্ষায়তনে স্বাগত করতে অনীহ ছিল না তারা। অন্যদিকে সরকারিপক্ষ এ বিষয়ে ভিন্ন মেরুর অবস্থানে। যেজন্যে মোটামুটি অবস্থাপন্ন, জমিদার-মহাজন শ্রেণীর লোকেদের সন্তানেরাই অমিশনারি বা সরকারি স্কুলসমূহে লেখাপড়ার সুযোগ পেত। মিশনারিরা চেয়েছে শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে, যদিও তা ধর্মীয় অনুপ্রেরণাসৃষ্ট। সরকারিপক্ষ শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে চায়নি—অর্থাৎ তাদের আগ্রহ ছিল কেবল সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর শিক্ষার বিষয়েই। সে কারণে সরকারি স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষাব্যয় মিশনারি স্কুলের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ব্যয়বাহুল্যই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ মানুষের শিক্ষার পথে। যদিও মুখে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে ছিল উচ্চকণ্ঠ। বাংলার গভর্নরের আন্ডার সেক্রেটারি হজসন প্র্যাট-এর এক রিপোর্টে (১৮৫৭) স্বীকারও করা হয় যে সরকারি স্কুলে শিক্ষাব্যয় তুলনামূলক বিচারে অধিক। ফলে অনাথ-দরিদ্ররা সরকারি স্কুলের খরচ যোগাতে ব্যর্থ হয়ে মিশনারি স্কুলমুখী হতে বাধ্য। এফ ডব্লু থমাসের 'দ্য হিস্ট্রি এ্যান্ড প্রসপেক্টস অব ব্রিটিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া' (১৮৯১) অনুসারে বলা যায় ১৮৫২-৫৩ সালের দিকে যখন সরকারি বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র সংখ্যা ২৮,০০০ তখন


www.pathagar.com

প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারি বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা লক্ষাধিক। তাছাড়া নারী শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের চেয়ে মিশনারিরা অধিক উদ্যোগী ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে সরকারি স্কুলে যখন নারীশিক্ষা বলতে গেলে শূন্যের কোঠায় তখন মিশনারি স্কুলে অনাথ ও দরিদ্র ছাত্রীর সংখ্যা তেরো হাজারের মতো। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য সত্ত্বেও মিশনারিরা যথার্থই আমজনতার শিক্ষাবিষয়ে অগ্রবর্তী ছিল। স্থূলভাবেও বলা চলে, মিশনারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা ছিল মূলত সমাজের নিম্নজীবী মানুষের সন্তান এবং সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা মধ্য ও উচ্চবিত্তদের সন্তান।

উনিশ শতকে ব্রিটিশদের দ্বারা বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার ভালোমন্দ সম্পর্কে মন্তব্য না করেও বলা যায় ইংরেজি শিক্ষাক্ষেত্রের দ্বিমুখী টানাপোড়েন শিক্ষাব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। শতাব্দীর প্রথমার্ধের মিশনারি শিক্ষার সাফল্য শতাব্দীর অপরার্ধের (১৮৫৪-র শিক্ষাভাষ্যের পর) সরকারি হস্তক্ষেপে অনেকটাই ম্লান হতে থাকে। যে উৎসাহ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্বব্যাপী হয়ে দেখা দেয় এবং যার একটা সামাজিক রূপও মিশনারিদের মধ্যে প্রভূত আগ্রহ জাগায় তা সরকারি উদ্যোগের পরিণামে কমে যেতে থাকে। আলেক্সান্ডার ডাফের 'দ্য ইন্ডিয়ান বেবেলিয়ন : ইটস্ কজেস এ্যান্ড রেজাল্টস্' (দ্বি. সং. ১৮৫৮) গ্রন্থে দেখি নারীশিক্ষা, নারীদের জন্যে বিনামূল্যে চিকিসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্রদের নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন প্রকৃতি কাজে মিশনারিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিচ্ছে। সেটা পরে আর বজায় থাকেনি। রপার লেথব্রিজের 'হাই এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া এ প্লি ফর দ্য স্টেট কলেজেস' (১৮৮২) গ্রন্থে সরকারি রিপোর্ট (১৮৫৪)-এর বরাত দিয়ে বলা হয় যে সরকারি রিপোর্টেও অর্ধশতাব্দীকালের মিশনারি শিক্ষার অবদানকে স্মরণ করা হয় গুরুত্বের সঙ্গে। এমনকি মিশনারিরাই যে প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে এবং বাংলায় শিক্ষার বিকাশসাধন করে তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি এতে আছে। ১৮২৪ সালে প্রকাশিত চার্লস লুসিংটনের 'দ্য হিস্ট্রি, ডিজাইন এ্যাড প্রেজেন্ট স্টেট অব দ্য রিলিজিয়াস' বেনেভোলেন্ট এ্যান্ড চ্যারিটেবল ইন্সট্যুটুশন্স, ফাউন্ডেড বাই দ্য ব্রিটিশ ইন ক্যালকাটা এ্যান্ড ইটস ভিসিনিটি' গ্রন্থ থেকে দেখা যায় ১৮১৯ সালে একদিন মাত্র ৩২ জন দেশীয় নারীসদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে কলকাতা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি স্কুল মাত্র এক বছরে সোসাইটিকে ৬টি স্কুল খুলতে হয় যাতে নারীশিক্ষার্থী দাঁড়ায় ১৬০ জনে। সোসাইটি নারীদের জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে এবং পড়া, লেখা এবং হস্তশিল্প (বিশেষত সুইসুতোর কাজ) শেখানোর মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভরতার দীক্ষা দেয়া হয়। পরবর্তীতে মিশনারিদের প্রবর্তিত পদ্ধতি নানাভাবে অনুসৃত হয় বাংলার বিভিন্ন নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু নারীদের উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ মিশনারিদের ন্যায় ততটা নিবেদিত প্রাণ ছিল না।


www.pathagar.com

সরকারি হস্তক্ষেপে শিক্ষা-বিষয়টা আর্থিক সামর্থ্য ও সঙ্গতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বলা যায় ১৮৫৪-র পর থেকে ওয়েস্টমিনিস্টার-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বাংলায় এবং ভারতবর্ষে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক স্বার্থের অনুগামী হয়ে পড়ে। শিক্ষা সম্পর্কিত সরকারি হিসেবেনিকেশ পূর্বেকার মিশনারিদের স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাদানের বিপরীত চরিত্রে আবির্ভূত হয়। ১৮৮২-র শিক্ষাভাষ্যে তা আরো স্পষ্টতা নিয়ে এল। তাতে ব্রিটিশ সরকারের স্পষ্ট ঘোষণা উচ্চারিত হয়, লাভজনক না হলে শিক্ষার পথে এগোবে না সরকার এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তারা অনুদান ও সহযোগিতা দেবে যথেষ্ট পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে। সরকারিপক্ষ নিজেদের শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় প্রাধান্য সংকুচিত করে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মিশনারিদের খ্রিষ্টীয় ধর্মের প্রচারণাকে দেখে সমালোচনার দৃষ্টিতে। বস্তুত শাসনভার কোম্পানির হাত থেকে সরকারের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় মিশনারিদের প্রভাবও ক্রমহ্রাসমান হতে শুরু করে।

শেষ পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা ম্যাকলে-প্রত্যাশিত শ্রেণী-শিক্ষাতেই সীমিত হয়ে থাকে অর্থাৎ জনসংখ্যার নগণ্য একটি অংশই শিক্ষার সুফল লাভ করে এবং তারাই ব্রিটিশ শাসকদের শাসন ও শোষণের অংশীদার হতে থাকে কালানুক্রমে। তবে ব্রিটিশ সরকার অর্ধশতাব্দীকালের পরিক্রমায় বিবর্তিত শিক্ষার ক্ষেত্রটি একদিনেই মিশনারিদের আওতা থেকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। নানা দ্বন্দ্ব, মতান্তর, বক্তব্য-বিতর্ক ও ধাপ পেরিয়ে তবে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে পৌঁছায়। সেই দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের অনেকখানিই সমকালীন বক্তব্য-বিবৃতি, পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ, রিপোর্ট ইত্যাদিতে প্রতিফলিত হয়ে আছে। এমনকি সরকারের বিভিন্ন অপ্রকাশিত প্রতিবেদনের নবতর মূল্যায়নে এ সম্পর্কিত অজানা তথ্যের উদ্ঘাটন সম্ভব। তাতে করে হয়ত বা ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশ শিক্ষার একেবারে নতুন চরিত্রও উন্মোচিত হতে পারে।

www.pathagar.com

ঐতিহ্য

ISBN-984-776-504-9

www.pathagar.com